“রোহিঙ্গা সংকটঃ বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও পর্যালোচনা”

শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার কার্যবিবরণী

১০অক্টোবর, ২০১৭

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ
(বিআইআইএসএস)

“রোহিঙ্গা সংকটঃ বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও পর্যালোচনা”

শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার কার্যবিবরণী

১০অক্টোবর, ২০১৭

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ
(বিআইআইএসএস)

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)
১/৪৬, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮) (০২) ৯৩৫৩৮০৮, ৯৩৩৬২৮৭, ৮৩১৫৮০৮
ফ্যাক্স: (+৮৮) (০২) ৪৮৩১২৬২৫
ইমেইল: info@biiss.org
ওয়েবসাইট: www.biiss.org

মুদ্রণ
গ্রাফনেট লিমিটেড
৯৫, নয়াপল্টন, খান টাওয়ার, ঢাকা-১০০০
ফোন: (+৮৮) (০২) ৯৩৫৪১৪২, ৯৩৫৪১৩৩, ০১৭১৫০১১৩০৩
ইমেইল: graphnet@gmail.com

অবতরণিকা

অতি সম্প্রতি মিয়ানমারের উত্তর-পশ্চিম রাখাইন রাজ্যে উদ্ভূত সহিংসতা এবং এর ফলস্বরূপ নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ একটি চরম মানবিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। রাখাইন রাজ্যে সীমানা চৌকিসমূহের উপর আক্রমণের অভিযোগ এবং কথিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলে মিয়ানমার নিরাপত্তা বাহিনীর দমন অভিযানের কারণে ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখ হতে ৫ লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশের জন্য তাদেরকে সহায়তা প্রদান করা প্রায় অসম্ভব হলেও শুধুমাত্র মানবিক কারণে তাদের প্রবেশাধিকার এবং আশ্রয় দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ কোন নতুন ঘটনা নয়। ১৯৭৮ সাল হতে বাংলাদেশকে এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে এবং মিয়ানমার সরকারের দীর্ঘদিনের দমননীতির কারণে উদ্ভূত বর্তমান অনুপ্রবেশ হলো চতুর্থ বারের মত বড় আকারের অনুপ্রবেশ। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত মিলিয়ে ৪ লক্ষের অধিক রোহিঙ্গা অবস্থান করছিল এবং মিয়ানমার সরকারের সাম্প্রতিকতম নৃশংসতার কারণে পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি হয়েছে। নতুন করে আগত ৫ লক্ষাধিকসহ এখন বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গার সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সম্পদ স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এই ভার বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে এবং এমতাবস্থায় গভীর আর্থ-সামাজিক ও নিরাপত্তা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫১ সালের আন্তর্জাতিক রিফিউজি কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের কনভেনশনটির প্রটোকল কোনটিরই স্বাক্ষরকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ১৯৭০ এর দশকের শেষ হতেই অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদেরকে নিজ ভূখন্ডে আশ্রয় দান ও সাধ্য অনুযায়ী সহায়তা করে আসছে।

উদ্ভূত বর্তমান সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার এদেশে আগত রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য খাদ্য ও আশ্রয়ের মতো মানবিক সহায়তা প্রদান করা সহ বিশাল ত্রাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সহায়তাপ্রাপ্তদের মধ্যে ৬ হাজার নবজাত শিশু আছে এবং অনাথ শিশুর সংখ্যা ইতিমধ্যে ৩৭ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। পাশাপাশি, এ সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য ঢাকা জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের জন্য, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে দেয়া তার ভাষণে জাতিসংঘ ও বিশ্ব সম্প্রদায়কে দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপের আহবান জানান। তিনি তার ভাষণে ৫ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন, যাতে - (ক) অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও জাতিগত নিধন নিঃশর্তে বন্ধ করা; (খ) রোহিঙ্গাদের জন্য 'সুরক্ষাবলয়' প্রতিষ্ঠা করা; (গ) রাখাইনে মুসলিমদের উপর সর্বপ্রকার নিপীড়ন বন্ধ করা; (ঘ) বাংলাদেশ হতে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা; এবং (ঙ) আনান কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা - অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ১৯৭৮ সালে প্রথমবার ও ১৯৯২ সালে দ্বিতীয় দফায় বড় ধরণের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের পর জাতিসংঘের সহায়তায় বাংলাদেশ দু'বারই প্রায় ২,৫০,০০০ করে রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে অসংখ্য রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ চলতেই থাকে। সাম্প্রতিক সংকটের আগেও, বিশেষতঃ মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত জাতিগত নির্মূল অভিযানের কারণে প্রায় ৪ লক্ষ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে এসে থেকে গিয়েছে এবং সাম্প্রতিক অভিযান শুরুর পর আরো ৫ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে। সাধারণ পরিষদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্বে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও, এই মানবিক বিপর্যয়ের প্রকৃত চিত্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট তুলে ধরতে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

ফলশ্রুতিতে, সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দ্রুত এবং শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এই সংকটের প্রারম্ভেই, বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়া ব্যাপক

ভিত্তিক কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্টোনিও গুটেরেসও বর্তমান নৃশংসতাকে ''জাতিগত নিধন" বলে আখ্যায়িত করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে এরূপ নৃশংসতা বন্ধের আহবান জানান। প্রভাবশালী প্রায় সব দেশ যেমনঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ওআইসি এবং আন্তর্জাতিক ও মানবিক সংস্থাসমূহ সকলেই রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে সমর্থন এবং সহায়তা প্রদান করে আসছে।

উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে, এ সমস্যায় সবচেয়ে বিপন্ন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের করণীয় কি হবে এবং কি ধরনের বাস্তবমুখী কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যাপক ভিত্তিক নীতিকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। মিয়ানমারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র চীনকে এ সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করাতে সফল হলে তা হবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক অর্জন। মিয়ানমারের আরেক সমর্থক রাশিয়া। অতীতে (২০০৭) চীন ও রাশিয়া উভয়েই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত নিন্দা প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করেছিলো। উভয় দেশের সঙ্গেই সমস্যাটি নিয়ে বাংলাদেশের আলোচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চীন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পক্ষ, কারণ মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর উপর তাদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সামরিক বাহিনীর উপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করা না গেলে রোহিঙ্গা সমস্যার আশু সমাধান করা সহজ হবে না। সমস্যাটির দ্রুত ও সফল সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রয়োজন বাস্তবমুখী, বহুস্তরবিশিষ্ট নীতি গ্রহণ করা। রোহিঙ্গাদের জন্য আন্তর্জাতিক তদারকিতে ''সুরক্ষাবলয়" গঠনের প্রস্তাবটি উত্তম, কিন্তু সেজন্য মিয়ানমারকে সম্মত করাতে হবে এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে এ বিষয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

অতএব, চলমান রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশে তাদের বিরতিহীন অনুপ্রবেশকে বিবেচনায় রেখে এর সমাধানকল্পে এবং করণীয় সম্ভাব্য বিভিন্নমুখী কার্যকৌশল অন্বেষণের লক্ষ্যে, বিআইআইএসএস ১০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে, "রোহিঙ্গা সংকটঃ বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও পর্যালোচনা" শীর্ষক একটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। এ আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী **জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি** এবং সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী **জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি**। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের শরনার্থী সেলের প্রধান, যুগ্ম সচিব **জনাব মোঃ হাবিবুল কবির চৌধুরী** 'আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ তৎপরতার বিবরণ'-শীর্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। **জনাব মোঃ শহীদুল হক**, পররাষ্ট্র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, 'রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় কূটনৈতিক তৎপরতার বিবরণ'-এর উপর আলোচনা করেন। **মেজর জেনারেল এ কে এম আবদুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি**, মহাপরিচালক, বিআইআইএসএস সেমিনারে সূচনা বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন **রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ**, চেয়ারম্যান, বোর্ড অব গভর্নরস, বিআইআইএসএস।

এছাড়াও উক্ত আলোচনায় প্রাক্তন রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, বাংলাদেশ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, সামরিক বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বিশেষজ্ঞগণ, শিক্ষকমন্ডলী এবং গণমাধ্যমের ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন।

সূচনা বক্তব্য

মেজর জেনারেল এ কে এম আবদুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি
মহাপরিচালক, বিআইআইএসএস

সূচনা বক্তব্যের প্রারম্ভেই **মেজর জেনারেল এ কে এম আবদুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি,** মহাপরিচালক, বিআইআইএসএস, "রোহিঙ্গা সংকটঃ বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও পর্যালোচনা" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ।

মেজর জেনারেল আবদুর রহমান গোলটেবিল আলোচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে চলমান রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশে তাদের বিরতিহীন অনুপ্রবেশকে বিবেচনায় রেখে এর সমাধানকল্পে এবং করণীয় সম্ভাব্য বিভিন্নমুখী কর্মকৌশল অন্বেষণের লক্ষ্যে বিআইআইএসএস এই গোলটেবিল আলোচনা আয়োজন করেছে । তিনি তার দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে বিআইআইএসএস এর এই উদ্যোগ বর্তমান রোহিঙ্গা সমস্যার সফল সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ প্রদান করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে ।

মেজর জেনারেল আবদুর রহমান মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে তাদের উপস্থিতির জন্য এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ রোহিঙ্গা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে তার সংক্ষিপ্ত সূচনা বক্তব্য সমাপ্ত করেন ।

সভাপতির বক্তব্য

রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব গভর্নরস, বিআইআইএসএস

রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ শুরুতেই গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি এর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সাম্প্রতিকতম নৃশংসতার কারণে ঐ অঞ্চলের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে বিরতিহীন অনুপ্রবেশ একটি গুরুতর বিপর্যয় ডেকে এনেছে। বিগত কয়েক সপ্তাহে ৫ লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে এবং এখনও পর্যন্ত তাদের এই অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। ইতিপূর্বে অবস্থানকারী নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাসহ বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থানকারী রোহিঙ্গার সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ বলেন, মানবিক দিক বিবেচনায় সীমিত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেছে। তবে তার মতে, এটি শুধুমাত্র একটি মানবিক সংকটই নয়, সেই সঙ্গে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাও গভীর হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী ও কার্যকর সমাধানে মিয়ানমারের অনীহা, অনমনীয়তা, ঐ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকার বৈষম্য ও নির্মম উৎপীড়ন সমস্যাটিকে ক্রমেই জটিলতর করে তুলেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলাদেশ কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সমস্যার আশু সমাধানের জন্য সর্বতোভাবে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে রাষ্ট্রদূত আহমদ অবহিত করেন।

রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ গোলটেবিল আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন- বর্তমান রোহিঙ্গা সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করা, এর সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্তৃক অদ্যাবধি গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করা। তিনি বলেন রোহিঙ্গা সংকটের দুটি দিক রয়েছে - প্রথমত, বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যায় রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ এবং এর ফলশ্রুতিতে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর ভার বহন করা বাংলাদেশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই রোহিঙ্গাদের আশ্রয়, খাদ্য, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও শৌচ ব্যবস্থা, চিকিৎসা সেবা ও নিরাপত্তাসহ বিশদ, বিস্তারিত ও সমন্বিত ত্রাণ তৎপরতা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই তৎপরতায় সহযোগিতার জন্য দেশের ভেতরে ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে বিপুল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মূল সমস্যার সমাধানে, অর্থাৎ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর চালানো বর্বর সহিংসতা অবিলম্বে বন্ধ করা এবং তাদের নিজ নিজ বাড়িঘরে নিরাপত্তা ও মর্যাদাসহকারে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য ব্যাপক, বহুমাত্রিক এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালিত হচ্ছে বলে তিনি তার বক্তব্যে মত প্রকাশ করেন। পরিশেষে, গোলটেবিল আলোচনার সামগ্রিক রূপরেখা প্রদান করার মাধ্যমে রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী **জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি,** তার বক্তব্যের প্রারম্ভে উল্লেখ করেন যে, সম্প্রতি মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নিরাপত্তা বাহিনী ও তাদের সহযোগী চরমপন্থি জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র দলের নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও দমন-পীড়ন, ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। প্রায় ৫ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়ায় তা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তিনি রোহিঙ্গা সমস্যাকে একটি পুরনো সমস্যা উল্লেখ করে, ১৯৭৮, ১৯৯২, ২০১২ ও ২০১৬ সালে নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বহু শতাব্দী ধরে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাস থাকা সত্ত্বেও, মিয়ানমারের বিগত সামরিক ও সেনা সমর্থিত সরকারসমূহ বৈষম্যমূলক ও নির্যাতনমূলক নীতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক ভাবে রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। ১৯৮২ সালের বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকারসহ সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। রোহিঙ্গা সমস্যার মূলে বৈষম্য ও অধিকার বঞ্চিত করার নীতি রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গারা অধিকার বঞ্চিত হয়ে নিজ দেশে চরম বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং জাতিসংঘ ইতিমধ্যে তাদের 'সর্বাধিক নিগৃহীত জনগোষ্ঠী' বলে ঘোষণা করেছে। তাদের চলাচল, জীবিকা, বিবাহ, সন্তান জন্মদান সহ সকল বিষয়ে কড়া বিধি নিষেধ আরোপের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনধারণের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর উপর সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে।

গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সহিংস হামলার জবাবে পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী মিয়ানমার সামরিক বাহিনী উত্তর রাখাইনের মংডু, বুথিডং এবং রাথিডং এ ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের ঘোষিত উদ্দেশ্য সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা করা হলেও, এর অন্তরালে বেসামরিক রোহিঙ্গাদের উপর নির্মম নির্যাতন চলে এবং এ ধ্বংসযজ্ঞ এখনও অব্যাহত রয়েছে। ফলে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণভয়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, সীমান্ত চৌকির উপর হামলা ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ঘটলেও এর প্রায় এক মাস আগে থেকে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী উত্তর

রাখাইন রাজ্যে ক্রমান্বয়ে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছিলো। একই সাথে উক্ত রাজ্যের কয়েকটি স্থানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে খাদ্য, পানিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। রোহিঙ্গাদের উপর হামলার ফলে সেখানে একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো। ২৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী তিন সপ্তাহে আনুমানিক ৩ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিম নিহত হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ২৮৪টি গ্রাম পোড়ানোর এবং ধ্বংসের প্রমাণ পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস, মিশনের প্রধান ও জাতিসংঘের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে টেকনাফে অবস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করেন এবং ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলেন। এ পরিদর্শন দলটি তমু সীমান্তে, সীমান্ত ফাঁড়ির পাশে নোম্যানস ল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণকারী একটি রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করে। এ শিবিরের অধিকাংশ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ঐ সীমান্তের নিকটবর্তী মিয়ানমারের একটি গ্রামের বাসিন্দা, যারা কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরিদর্শন দলের সদস্যরা রোহিঙ্গাদের সাথে আলাপকালেই সীমান্তের মিয়ানমারের দিকে অবস্থিত রোহিঙ্গা গ্রামগুলোতে আগুন জ্বলতে দেখেছিলেন। যেটি মিয়ানমার সরকারের নিপীড়নমূলক নীতির একটি বড় প্রমাণ বলে মাননীয় মন্ত্রী মত প্রকাশ করেন। উত্তর রাখাইনের সাম্প্রতিক সংঘাতের ফলে ৫ লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গার সাথে সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের সংখ্যা যোগ হয়ে তা ৯ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। মিয়ানমারের উত্তর রাখাইনে বসবাসরত ১৭-১৮ লক্ষ রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৯ লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গাকে বিভিন্ন অজুহাতে বাংলাদেশ ঠেলে দেয়া হয়েছে এবং আরও ৪ লক্ষ রোহিঙ্গা বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। কার্যত, এখন মিয়ানমারে আনুমানিক ৪ থেকে ৫ লক্ষ রোহিঙ্গা অবশিষ্ট রয়েছে।

এর মধ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন আইডিপি ক্যাম্পে অবস্থান করছে এবং বাকিরা বিভিন্ন গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছে। ২৫ আগস্টের ঘটনার পরে সচেতনভাবেই রোহিঙ্গা মুসলিমদের ভয় দেখিয়ে এবং নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে মংডু এবং বুথিডং রোহিঙ্গা শূন্য করে ফেলা হচ্ছে এবং বাকিদের মংডুতে বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গা মুসলিমদের মূল অংশ বাংলাদেশে চলে এসেছে। অন্যদিকে, মিয়ানমারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিগত ভারসাম্য আনার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন। মিয়ানমার সামরিক বাহিনী উগ্রপন্থি বৌদ্ধ ও রাখাইন সম্প্রদায়ের সহায়তায় উত্তর রাখাইনের জাতিগত ভারসাম্য আনার পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবারকার সংঘাতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নির্মূল করার প্রচেষ্টায়, মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর দ্বারা রাখাইন উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তিকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান একটি উল্লেখযোগ্য এবং নতুন সংযোজন। মিয়ানমার সরকারের রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রের সহায়তায় জনসাধারণের ভেতরে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে ভুল তথ্য প্রচার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টাও লক্ষণীয়। ২৫ আগস্টের হামলার বিষয়টিকেও 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদ' বা 'উগ্রপন্থি বাঙালি সন্ত্রাসবাদ' বলে প্রচার করছে মিয়ানমার সরকার ও মিডিয়া। এ পরিকল্পিত প্রচারণার মাধ্যমে প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্তর রাখাইনে গণহত্যা ও জাতিগত নির্মূল অভিযানের বিরুদ্ধে নিন্দা ও সহিংসতা বন্ধের আহবানও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশমুখী ঢল বন্ধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্বিচার সহিংসতায় আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগ প্রকাশ করা সত্ত্বেও মিয়ানমার সামরিক বাহিনী তাদের রোহিঙ্গা বিতাড়নের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছে।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, মিয়ানমারকে মূল সমস্যার সমাধান করতে হবে। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বসহ অন্যান্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৈষম্যমূলক নীতির অবসানের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ করে দিতে হবে। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অপপ্রচার, জাতিগত বিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়বাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চাপ প্রয়োগ না করলে মিয়ানমার মূল সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হবে না

বলে তিনি মনে করেন। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান এর নেতৃত্বে গঠিত আনান কমিশন রোহিঙ্গা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা পেশ করেছে। এ সুপারিশমালা পূর্ণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন মূল সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে বলে তিনি অভিমত দেন। সুপারিশমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরো তৎপর হতে হবে। রোহিঙ্গা সমস্যা এখন শুধু মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং এটি এখন আঞ্চলিক সমস্যায় রূপ নিয়েছে। তাছাড়া এটি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা নয় এবং এ সমস্যা সৃষ্টিতে বাংলাদেশের কোন ভূমিকাও নেই। সমস্যার সৃষ্টি ও এর কেন্দ্রবিন্দু মিয়ানমার এবং সমাধানও সেজন্য মিয়ানমার-এ নিহিত রয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মত প্রকাশ করেন। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। মিয়ানমারে ২০১৬ সালের মার্চ মাসের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নির্বাচিত এনএলডি বা ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশ সরকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বার্তা নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা দূত হিসেবে পররাষ্ট্র সচিব গত ৩০ জুন থেকে ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখে মিয়ানমার সফর করেন। গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভার সাইডলাইনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি এর মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। তাছাড়া অক্টোবর ২০১৬ তারিখে ভারতের গোয়াতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস-বিমসটেক আউটরিচ সামিট এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচির পুনরায় আলোচনা হয়েছে। এ সকল বৈঠকে বাংলাদেশ দুই দেশের মধ্যে ভুল ধারণার অবসান এবং এনএলডি সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। তথাপি এনএলডি কর্তৃক গঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ও মিয়ানমার বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিস্পৃহ রয়েছে। এ দ্বিপাক্ষিক সফরগুলিকে মিয়ানমার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হচ্ছে। যদিও বাংলাদেশের

প্রতি মিয়ানমারের উদাসীনতা ও রাখাইন মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রান্তিকীকরণ নীতি পরিবর্তনের কোনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই, তথাপি প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার সরকারের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের কোনও বিকল্প নেই। গত অক্টোবর ২০১৬ থেকে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের উদ্দেশ্যে বহুমুখী কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে চার দফা রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বর ২০১৬, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, মার্চ ২০১৭ এবং সর্বশেষ ৩০ আগস্ট ২০১৭ তে অনুষ্ঠিত এ সকল বৈঠকে রোহিঙ্গা নির্যাতনে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সকল সদস্য তিন দশক ধরে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় ও মানবিক সাহায্য প্রদান এবং আরও ৫ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দানের জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। নিরস্ত্র মুসলিম রাখাইন জনগোষ্ঠীর উপর মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর নির্মম নির্যাতন ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আঞ্চলিকসহ

গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহ এবং জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশন, মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনসহ অসংখ্য সংস্থা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এছাড়াও তারা সহিংসতা, নির্যাতন বন্ধ এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়ার বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানিয়েছে বলে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের দ্বিতীয় অংশ হল, বাংলাদেশ থেকে সকল রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেয়া এবং এ ব্যাপারেও মিয়ানমারকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মত প্রকাশ করেন। সেখানে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের জন্য উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও জীবিকার নিশ্চয়তা না পেলে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা ফিরে যেতে আগ্রহী হবেনা। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের জন্য দ্বিপাক্ষিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ গত ২৫ মে ২০১৭ তারিখে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরুর প্রস্তাব দিয়েছিল একটি নন-পেপার উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। পরবর্তী সময়ে ৭২তম জাতিসংঘ সম্মেলন চলাকালে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে মিয়ানমারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে আলাপ করেন এবং আরেকটি সংশোধিত নন-পেপার হস্তান্তর করেন বলে মাননীয় মন্ত্রী জানান। প্রত্যাবাসন বিষয়ে আলোচনার জন্য মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলরের দপ্তরের মন্ত্রী উ চ টিন্ট সোয়েকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং এর ফলশ্রুতিতে তিনি ০২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন এবং তার সাথে একটি বৈঠকে মিলিত হন। উক্ত আলাপকালে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলরের দপ্তরের মন্ত্রী, ০৯ অক্টোবর ২০১৬ এবং ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখের পরে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের ১৯৯২ সালের যৌথ বিবৃতিতে বিধৃত নীতি বা শর্তাবলি অনুসরণ করে একটি যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফেরত নেয়ার প্রস্তাব করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ, ১৯৯২ সালের সাথে বর্তমান সমস্যার মাত্রা ও প্রকৃতির ভিন্নতার বিষয়টি তুলে ধরে এবং বাস্তবতার নিরিখে ১৯৯২ সালের নীতি ও শর্তাবলীর পুনর্বিবেচনা ও নতুন কাঠামো ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বলে তিনি জানান। মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন যে, সম্ভাব্য প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, তিনি নিজে একটি 'দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা' স্বাক্ষরের প্রস্তাব করেন এবং এর একটি খসড়া হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে মিয়ানমারের আশ্রয় গ্রহণকারী নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের উপর জোর দিয়েছে এবং যাচাই প্রক্রিয়ায় যোগ্য বিবেচিত সকল রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আগমনের তারিখ বিবেচনা না করে ফেরত নেয়ার প্রস্তাব করেছে। প্রত্যাবাসনের যোগ্যতা নির্ধারণে মিয়ানমারের নিজস্ব যাচাই প্রক্রিয়ার প্রস্তাবের বিপরীতে বাংলাদেশ যৌথ যাচাই প্রক্রিয়ার প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থার খসড়ায় এ প্রত্যাবাসনের সকল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষত, আইওএম (ইন্টারন্যাশনাল অগানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন) ও ইউএনএইচসিআর (ইউনাইটেড নেশনস হাইকমিশন ফর রিফিউজিস) কে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে। দুই পক্ষ সম্ভাব্য প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে একটি জয়েন্ট ওয়াকিং গ্রুপ গঠনের পক্ষে একমত হয়েছে। বর্তমানে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য আগামী সপ্তাহগুলিতে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা চূড়ান্তকরণে অগ্রগতি এবং জয়েন্ট ওয়াকিং গ্রুপ গঠনে ও কার্যবিধি চূড়ান্তকরণে মিয়ানমারের আগ্রহের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া।

তিনি উল্লেখ করেন রোহিঙ্গাদের আংশিকভাবে ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব মিয়ানমারের আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ও চাপ প্রশমিত করার কৌশলও হতে পারে। মিয়ানমার নিজস্ব যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য প্রত্যাবাসন প্রত্যাশীদের সংখ্যা সীমিত করার ও নানা অজুহাতে কফি আনান কমিশনের সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন বিলম্বিত করতে পারে বলে মনে করেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রত্যাবাসন একটি জটিল ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক মহলের নজরদারী ও সহযোগিতা ছাড়া মিয়ানমারকে দীর্ঘ মেয়াদে প্রত্যাবাসনে আগ্রহী রাখা কঠিন হবে। বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ উপায়ে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান চায়। এ লক্ষ্যে বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বাংলাদেশ চালিয়ে যাচ্ছে বলে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান। বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন রয়েছে; অতএব, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিতভাবে মিয়ানমারের উপর প্রয়োজনীয় চাপ প্রয়োগ করতে হবে। যাতে করে এনএলডি সরকার রাখাইনে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি ও জীবন যাপনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে ইতিবাচক নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে এবং মিয়ানমার সামরিক বাহিনী নেতিবাচক কর্মকান্ড থেকে সরে আসতে ও বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ এ উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের মধ্যে এবং গণমাধ্যমে যে গঠনমূলক আলোচনা হচ্ছে তার প্রশংসা করেন। একই সাথে তিনি ০৮ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের দৈনিক প্রথম আলোতে রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ে প্রকাশিত দুইটি সাক্ষাতকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। "সরকারের উদ্যোগে অনেক ঘাটতি আছে" শিরোনামে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার প্রদত্ত সাক্ষাতকারে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে যে সকল পদক্ষেপ নিবে বলে জানান, সে সকল পদক্ষেপই বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বরং এ সমস্যা নিরসনে এর চেয়েও বেশি কার্যকর পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করছে বলে মাননীয় মন্ত্রী জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেন, মিয়ানমার সরকারের বেসামরিক এবং সামরিক অংশের মধ্যে যে বিভাজন আছে সেটাকে বিবেচনায় রেখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের কূটনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা সমূহের বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন এবং রাখাইনে রোহিঙ্গাদের প্রতি অমানবিক নির্যাতনের জন্য মিয়ানমার সরকারের সমালোচনার কথাও উল্লেখ করেন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়াও জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার রাখাইনে রোহিঙ্গা নিধনকে যে 'জাতিগত নিধনের সর্বোত্তম/সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন তারও উল্লেখ করেন। এ ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের সাফল্যের পেছনে সরকারের বিগত দুই বছরের জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অবদান রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিকভাবে মিয়ানমার সরকারের সাথে আলোচনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেও সম্পৃক্ত করে এ সংকট নিরসনে কাজ করছে। জাকার্তায় ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ওশান রিম এসোসিয়েশনের (IORA) প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে মিয়ানমার সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলাপ করেছিলেন এবং তাকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং এর ফলশ্রুতিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেন। এছাড়াও বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কূটনৈতিক মিশন প্রধানদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে অবহিত করা হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৮৯ সালের লেবাননের গৃহযুদ্ধ বিষয়ক সংকটের পর এই প্রথম জাতিসংঘের কোনও মহাসচিব স্বপ্রণোদিত হয়ে নিরাপত্তা পরিষদকে চিঠি দিয়ে এই সংকট নিয়ে বৈঠকে বসতে আহবান জানান। এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিতব্য ইইউ ভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে রোহিঙ্গা নিয়ে আলোচনা হবার সম্ভাবনার কথা জানান এবং এর ফলস্বরুপ, মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর উপর, বিশেষত মিয়ানমারের সামরিক প্রধানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হতে পারে বলে সকলকে অবহিত করেন। পরিশেষে, গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি তার বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব মোঃ হাবিবুল কবির চৌধুরী
যুগ্ম সচিব, শরণার্থী সেলের প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব মোঃ হাবিবুল কবির চৌধুরী তার বক্তব্যে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ থেকে প্রায় ৫ লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। তিনি পূর্বের বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সকলের সামনে তুলে ধরেন।

১৯৭৮ সালে সর্বপ্রথম, দুই লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তীতে ঐ সব রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন করানো হয়েছিল। ১৯৯১-১৯৯২ সালে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত ৭৭ জন রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসে। তার মধ্যে থেকে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫ শত ৯৯ জনকে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন করানো সম্ভব হয়। তাদের মধ্যে কিছু রোহিঙ্গা এখনও বাংলাদেশে রয়ে গেছে, যার মধ্যে কিছু মৃত্যুবরণ করেছে এবং কিছু নতুন জন্ম গ্রহণ করেছে। ১৯৯১-৯২ সালে মিয়ানমার থেকে অনুপ্রবেশকৃত প্রায় ৩৪ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিবন্ধিত শিবিরে অবস্থান করছে। ইউএনএইচসিআর এবং ডব্লিউএফপি এর মাধ্যমে তাদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ১৯৯১-৯২ এর পর থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বাংলাদেশে আগমনকারী রোহিঙ্গাদের সঠিক সংখ্যাটি এখনও নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। ২০১৬ সালে এক সাথে ৮৭ হাজার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করে। ২৫ আগস্ট ২০১৭ এর পর থেকে ০৯ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার রোহিঙ্গা গণনা করা সম্ভব হয়েছে। এই গণনার মধ্যেও কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। চলমান নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ হলে সঠিক সংখ্যাটি জানা যাবে।

এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ১৭ টি স্থানে অবস্থান করছে। কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফের ১৫ টি স্থানে এবং বান্দরবন জেলার নাইক্ষ্যংছড়ির দুটি স্থানে এরা অবস্থান করছে। সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এজন্য সরকার ৩ হাজার একর জমি বরাদ্দ করেছে। বর্তমানে তাদের জন্য অস্থায়ী আবাসন নির্মাণ করা হচ্ছে। ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে সকল রোহিঙ্গাকে হয়তো একই স্থানে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের কার্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদান এবং তাদেরকে মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় এবং দায়িত্ব সংক্রান্ত ২২ টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন মন্ত্রণালয় কি কাজ করবে সেই সভায় এসব নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট হচ্ছে, দুর্যোগ মোকাবেলা করা। রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ একটি মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, তাই আন্তর্জাতিক শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (UNHCR), আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই দুর্যোগ মোকাবিলায় সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করছে। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়ার পর, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ থেকেই কাজ শুরু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ অধিদপ্তরের

মহাপরিচালকসহ সাত থেকে আট জন কর্মকর্তা ৫ দিন সেই এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের কার্যালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে ধারণা নিয়েছেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন এনজিও, সশস্ত্র বাহিনী, ইউএনএইচসিআর, আইওএম, ডব্লিউএফপি তাদের সকলের সাথে সমন্বয় সভা করেছেন এবং কার্যক্রমকে কিভাবে আরও ভালভাবে পরিচালনা করা যায় সে বিষয়ে তাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

জনাব মোঃ হাবিবুল কবির চৌধুরীর ভাষ্যমতে, এই বিপুল সংখ্যক মানুষের ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য অনেক কাজ করা দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলো হলোঃ অস্থায়ী আবাসন নির্মাণ, খাদ্য সরবরাহ করা, পানির ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা, শিশু খাদ্যের ব্যবস্থা করা, গর্ভবর্তী মহিলাদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ করা, এতিম শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, রোগ বালাই যেন না ছড়ায় সে জন্য টিকাদান-এর ব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি নিরাপত্তা বিধান করা। এই কাজগুলো করার জন্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যুক্ত আছে। কিছু এনজিও কাজ করছে। কিছু ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত পর্যায়েও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ শুরু করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যে সভা হয়েছিল, সেই সভার আলোকে এযাবত কি কি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, সে ব্যাপারেও জনাব হাবিবুল কবীর চৌধুরী কিছু আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে, সেই সভায় ৪ লক্ষ আশ্রয় প্রার্থীকে বিবেচনায় আনা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই সংখ্যা ৭ লক্ষ অতিক্রম করেছে। যদিও মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৯ লক্ষের কথা বলেছেন, তবে নিবন্ধন কাজ শেষ হলে সঠিক সংখ্যাটি নিরুপণ করা সম্ভব হবে। ধারণা করা হচ্ছে ৭ লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অবস্থান করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৪ হাজার অস্থায়ী আবাসন নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রতিটি আবাসনে ৬ টি করে পরিবার এবং প্রতি পরিবারে ৬ জন করে সদস্য ধার্য করা হয়েছিল। সেই হিসেবে ৫ লক্ষ ৪ হাজার রোহিঙ্গার জন্য অস্থায়ী আবাসন এর ব্যবস্থা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এখন ইউএনএইচসিআর, আইওএম এবং অন্যান্য সংস্থা বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী যেমন, তারপোলিন, বাঁশ ইত্যাদি সরবরাহ করছে। রোহিঙ্গা আশ্রয় প্রার্থীরা নিজেরাই নিজেদের অস্থায়ী আবাসন তৈরি করে নিচ্ছে। পরে যখন পরিকল্পিতভাবে আবাসন তৈরি করা হবে, তখন প্রয়োজনে পুনঃব্যবস্থা করা যাবে। মহিলা প্রধান পরিবারগুলো যাদের সাথে পুরুষ নেই, যাদের নিজেদের অস্থায়ী আবাসন তৈরি করার মত সামর্থ্য নাই, তাদের জন্য লোক নিয়োগ করে তাদের অস্থায়ী আবাসন তৈরি করে দেয়া হচ্ছে। বন বিভাগের ৩ হাজার একর জমি সরকার ইতিমধ্যে বরাদ্দ করেছে। প্রয়োজন হলে আরও জমি বরাদ্দ করা যেতে পারে। যেই এলাকাতে তাদের আবাসন দেয়া হয়েছে, সেই এলাকাকে ২০টি ব্লকে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ব্লককে পরবর্তীতে একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে ধরা হবে। প্রত্যেক ব্লকে একজন ক্যাম্প ইন-চার্জ থাকবেন এবং নিরাপত্তা, খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থাও পরবর্তীতে করা হবে। বর্তমানের দেড় লক্ষ অস্থায়ী আবাসন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি ঘরে গড়ে ৬ জন করে থাকলে ৯ লক্ষ লোকের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা যাবে। ০৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৭৯ হাজার অস্থায়ী আবাসন নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে দেড় লক্ষ ঘর তৈরি করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। ০৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত যে অস্থায়ী ঘরগুলো তৈরি করা হয়েছে, সেখানে তিন লক্ষ আশ্রয় প্রার্থীকে স্থানান্তর করা হয়েছে। নাইক্ষ্যংছড়িতে যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীরা আছেন তাদেরকেও উখিয়াতে নিয়ে আসার একটা পরিকল্পনা আছে। উখিয়ার কুতুপালং এলাকার আশে-পাশেই এই শিবিরগুলো তৈরি করা হবে। বান্দরবনের নাইক্ষ্যংছড়ির ৭ হাজার আশ্রয় প্রার্থীকে উখিয়ার আশ্রয় শিবিরে ইতিমধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। অস্থায়ী আবাসন নির্মাণ শেষ হয়ে গেলে বাকি ১০ হাজারকেও উখিয়াতে নিয়ে আসা হবে।

জনাব মোঃ হাবিবুল কবির চৌধুরী মনে করেন, বর্তমানে প্রধান কাজ হচ্ছে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। এই কাজে ডব্লিউএফপি ব্যাপক সহায়তা করছে। ডব্লিউএফপি বর্তমানে ৫ লক্ষ ২০ হাজার লোককে খাদ্য সরবরাহ করছে। তারা প্রতি ১৫ দিন পর পর খাদ্য সরবরাহ করে। এর বাইরে আরও কিছু এনজিও আছে, যারা প্রায় এক লক্ষ লোকের জন্য খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে। সশস্ত্র বাহিনী ত্রাণ বিতরণে সংযুক্ত হওয়ার পর থেকে ত্রাণ তৎপরতায় একটি শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। ডব্লিউএফপি এবং এনজিওদের খাদ্য সরবরাহ আওতার বাইরে যারা আছেন তাদের জন্য প্রতিদিন গড়ে

সর্বনিম্ন ৫০ ট্রাক থেকে সর্বোচ্চ ১৯৩ ট্রাক পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এই খাদ্য-সামগ্রী পাঠাচ্ছে। বর্তমানে এই খাদ্য-সামগ্রী সেনাবাহিনীর সহায়তায় জেলা প্রশাসনের তত্ত্বধানে বিতরণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৮ হাজার টন খাদ্য-সামগ্রী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পাওয়া গেছে।

তিনি বলেন, সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নলকূপ স্থাপনের কাজ করছে। প্রায় ৪ হাজার নলকূপ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান ১,৪৬৫ টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। ১৭,৫০০ টি শৌচাগার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৩,১৬৫ টি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। বেশির ভাগ শৌচাগারগুলো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থাপন করেছে। এর বাইরে কিছু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান থেকেও করা হয়েছে। ইউনিসেফ ১০ হাজার শৌচাগার তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। এজন্য তারা ১১ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। এই কাজটা সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে করা হবে। প্রয়োজনে তারা আরও বেশি শৌচাগার তৈরি করে দিতে সম্মত হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, ১৭ কিঃ মিঃ নতুন বিদ্যুৎ লাইন তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৯ কিঃ মিঃ বিদ্যুৎ লাইন তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী কাজ খুব শীঘ্রই শেষ করা হবে। সংযোগ সড়কের অভাবে ত্রাণ বিতরণ এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই নতুন আশ্রয় শিবিরগুলোতে সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ২০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্যের মূল সংযোগ সড়ক নির্মাণ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এর মধ্যে ৩.৫ কিঃ মিঃ শেষ হয়েছে। কিছু সংযোগ সড়কের কাজ স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) বাস্তবায়ন করছে। ১০ টি ছোট সংযোগ সড়কের কাজ এলজিইডি হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে ৫ টি সড়ক সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকি ৫টি সড়কের কাজ অব্যাহত আছে।

অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে জনাব মোঃ হাবিবুল কবির চৌধুরী বলেন যে, ৭ লক্ষ লোকের জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা একটা কঠিন কাজ। বর্তমানে ৩৫টি মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। আরও ক্যাম্প স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। পরিবার ও পরিকল্পনা বিভাগও সেখানে কাজ করছে। মাতৃ-স্বাস্থ্য সেবাও সেখানে প্রদান করা হচ্ছে। উখিয়া টেলিভিশন কেন্দ্রের পাশে নরওয়ে ভিত্তিক রেডক্রস-এর সহাযোগিতায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ষাট শয্যার একটি হাসপাতাল নির্মার্ণের কাজ হাতে নিয়েছে। আরআরসি-এর তত্ত্বাবধানে শরণার্থী স্বাস্থ্য ইউনিট ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সেখানে কাজ করছে। কক্সবাজার জেলার সদর হাসপাতালের বেডের সংখ্যা এবং ডাক্তার সংখ্যা আগের চেয়ে বাড়ানো হয়েছে এবং ঔষধের পরিমানও বাড়ানো হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ২ শত জনকে এমআর টিকা দেওয়া হয়েছে এবং ৭৫ হাজার ১ শত ২০ জনকে ও.পি.ডি. দেওয়া হয়েছে। ৭২ হাজার ৮ শত ৪০ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীসহ ১২ লক্ষ লোকের জন্য কলেরার টিকা দেওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার ৭ শত ৫০ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ডব্লিইএফপি ৪৬ টি খাদ্য গুদাম তৈরি করে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছে। বর্তমানের ছয়টি গুদাম তৈরি করা হয়েছে, যা সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে আছে। এই ৪৬ টি খাদ্য গুদামের মধ্যে ২০ টি গুদাম হবে রোহিঙ্গা আবাসস্থলের ২০ টি ব্লকে, ১২ টি চট্টগ্রামে, ২ টি এয়ারপোর্টে এবং ২ টি হবে সমুদ্র বন্দরে। খাদ্য সাহায্য আসলে সেটাকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ করার জন্য চট্টগ্রামের গুদাম ব্যবহার করা হবে।

জনাব মোঃ হাবিবুল কবির চৌধুরী বলেন নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করার দায়িত্ব পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে এই কার্যক্রমটি খুব বেশী গতি পায়নি। অনেক রোহিঙ্গাই নিবন্ধিত হতে চায় না। এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, পরবর্তীতে তাদের জন্য নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হবে। ০৯ অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত মাত্র ৮৩ হাজার ৩ শত ২৮ জনের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এতিম শিশুদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাদের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা ৬ হাজার ৬ শত ৬৬ জন এতিম বাচ্চাকে চিহ্নিত করেছেন যাদের জন্য "শিশু পল্লী" এর মত আলাদা সেন্টার করার কথা চিন্তা করা হয়েছে।

বিভিন্ন সংস্থা এবং দেশ থেকে প্রাপ্ত ত্রাণ সহায়তার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১০ লক্ষ টাকা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় থেকে ৩০ লক্ষ টাকা এবং ৫০০ মেট্রিক টন খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে। বিভিন্ন বন্ধুপ্রতিম দেশ যেমন, তুরস্ক, মরক্কো, আজারবাইজান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও ভারত থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে। তুরস্ক আশ্বাস দিয়েছে যে, এক লক্ষ আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য তারা অস্থায়ী আবাসন, খাদ্য, স্যানিটেশন, চিকিৎসাসহ সবধরনের সহায়তা প্রদান করবে। অনেক সময় অনেক ত্রাণ আসে যেটার এখন প্রয়োজন নেই। তাই কি কি জিনিস প্রয়োজন সেটির একটি তালিকা তৈরী করা হয়েছে। যারা ত্রাণ দিতে আগ্রহী, তাদের কাছে সেই তালিকা পাঠানো হয়েছে। ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য চট্টগ্রামে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী, কাস্টমস এবং সংশ্লিষ্ট সবাই সেখানে একসাথে কাজ করছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ এবং বিজিবিও আশ্রয় শিবিরগুলোতে কাজ করে যাচ্ছে। ৩৪ হাজার লিটার খাবার পানি সরবরাহ করতে সক্ষম এ রকম দুইটি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

জনাব মোঃ হাবিবুল কবির চৌধুরী রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে কিছু প্রস্তাবনার কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত, জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিকভাবে মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারীদের সম্মানের সাথে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন, স্বল্প সময়ের ভিতরে যদি রোহিঙ্গাদেরকে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন করানো না যায়, তাহলে কক্সবাজারের মত এলাকায় তাদের রাখা ঠিক হবে না। কারণ এতে কক্সবাজারের সৌন্দর্যহানি ঘটবে এবং পর্যটক শূন্য হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে নোয়াখালীর ভাসানচর এলাকায় তাদেরকে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। উখিয়া এবং টেকনাফের যে এলাকায় রোহিঙ্গারা বসবাস করছে সেখানে স্থানীয় অধিবাসীরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তিনি মনে করেন, এর ওপর একটা সমীক্ষা চালানো প্রয়োজন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্যথায় তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে।

তিনি মন্তব্য করেন, রোহিঙ্গারা যদি দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে অবস্থান করে তাহলে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রচুর পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রীর প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধুপ্রতিম দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে জোরালো প্রতিশ্রুতি আদায় করা দরকার। একই সাথে ওআইসি ভুক্ত দেশগুলোর সাথে আরও যোগাযোগ বাড়ানোর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনাব মোঃ শহীদুল হক
পররাষ্ট্র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পররাষ্ট্র সচিব **জনাব মোঃ শহীদুল হক** তার আলোচনার শুরুতেই মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, সম্মানিত সভাপতি এবং উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পররাষ্ট্র সচিব তার বক্তব্যে চারটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। এই চারটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে রোহিঙ্গা সমস্যাটাকে সংজ্ঞায়িত করা এবং এর অবয়বটিকে বুঝতে পারা। এই সমস্যাটাকে আন্তর্জাতিকভাবে কিভাবে দেখা হচ্ছে বা সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে সেটাও বুঝতে পারা। কারণ এটার উপরই নির্ভর করবে বাংলাদেশের কূটনৈতিক পদক্ষেপ কি হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে যে, বাংলাদেশের এই রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি আছে কিনা। যদি কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি থেকে থাকে তাহলে সেই নীতিটা কি এবং কবে থেকে এই নীতির চর্চা করা হচ্ছে। তৃতীয়ত, অক্টোবর ২০১৬ থেকে বিপুল পরিমাণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অনুপ্রবেশ এর পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ কি ছিল। চতুর্থত, এই সমস্যা যথার্থভাবে মোকাবেলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে।

প্রথমত, পররাষ্ট্র সচিব রোহিঙ্গা সমস্যাটাকে "বহুবিধ, বহু-স্তরবিশিষ্ট, জটিল ও জরুরি সমস্যা" হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ সমস্যার একটি মানবিক দিক যেমন আছে, তেমনই এর সাথে সীমান্ত এবং নিরাপত্তার বিষয়টিও জড়িত। এই তিনটি বিষয়ের সম্মিলিত রুপ হচ্ছে এ রোহিঙ্গা সমস্যা। তার মতে, বিশ্বের যেকোনো স্থানে বিপুল পরিমাণে মানুষ উদ্বাস্তু হলে এরকম জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়; সেটা বাংলাদেশেই হোক, ইউরোপেই হোক অথবা অন্য যেকোনও দেশেই হোক। সুতরাং এই রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে একটি "এক-স্তর বিশিষ্ট" বা "একমাত্রিক" সমস্যা হিসেবে দেখার কোনো কারণ নেই। যে কারণে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রথম থেকেই এই সমস্যাটিকে একটি বহুমাত্রিক সমস্যা হিসেবে দেখে আসছে। এই প্রসঙ্গে মাননীয় পররাষ্ট্র সচিব বলেন যে, এই সমস্যাটি নিয়ে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনেক আগে থেকেই কাজ করছে।

এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব বলেন কোনো কোনো মহলের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, দলে দলে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের পরেই কেবলমাত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তাদের কূটনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে। এই উদাহরণ টেনে পররাষ্ট্র সচিব দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এরকম ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবেলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল পদক্ষেপের একটি সামগ্রিক চিত্র নাগরিক সমাজের সামনে তুলে ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পররাষ্ট্র সচিব এই প্রসঙ্গে বলেন, এ ধরণের দূর্ভাগ্যজনক ধারণা কূটনীতিকদের মধ্যে হতাশার জন্ম দেয়। তিনি মনে করেন, ভবিষ্যতে যদি কখনও সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিয়ে কোনো গবেষণা হয় তাহলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কত আগে থেকে এ বিষয় নিয়ে কাজ করছে তা বের হয়ে আসবে। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশের কূটনীতিকরা আবদ্ধ ঘরে বসে কাজ করেন না বরং যেসব এলাকায় দলে দলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অনুপ্রবেশ করেছে সেসব এলাকা, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো এবং তাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সব কিছুই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরেজমিনে দেখেছে।

দ্বিতীয়ত, পররাষ্ট্র সচিব রোহিঙ্গা সমস্যা যথার্থভাবে মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের নীতির বিষয়টি তার আলোচনায় নিয়ে আসেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই এই সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং মন্ত্রিসভায় এবিষয়

নিয়ে দু'বার আলোচনা হয়। সাথে সাথে এই সমস্যার যে একটা দ্বিপাক্ষিক প্রেক্ষাপট ছিল সেই পথও ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। পররাষ্ট্র সচিব এবারকার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকে 'চতুর্থ প্রবাহ' (4th wave) বলেছেন যার আগে ১৯৭৮-৭৯, ১৯৯১-৯২ এবং ২০১২ তে এ ধরণের বড় আকারে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে মিয়ানমারে সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে রোহিঙ্গারা দেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে। ২০১৬ সালের সেই সময় থেকেই রোহিঙ্গারা আসছিল কিন্তু ২০১৭ সালের আগস্টে নতুন করে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অমানবিক নির্যাতনের মুখে লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া শুরু করে যেটা এখনও অব্যাহত আছে। সুতরাং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে সাথে নিয়ে বিশেষ করে ত্রাণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই সমস্যাটি নিয়ে অনেক আগে থেকেই কাজ করছে। সুতরাং এ বিষয়টি নিয়ে কোন কাজ বা নীতি না থাকার কথা না। পররাষ্ট্র সচিব আরো বলেন যে, এখন যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী আছেন তিনি ১৯৯১-৯২ তে এই সমস্যাটি নিয়ে একটি চুক্তি আলোচনা করেছিলেন। এর আগেও এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য একটা চুক্তি ছিল। সুতরাং এই সমস্যাটি নতুন নয়, এর ইতিহাস আছে, অভিজ্ঞতা আছে এবং এর পর্যালোচনাও আছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই সমস্যা যথার্থভাবে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে সব রকম নীতি নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করে বিশেষ করে ২০০৮-০৯ এর সময়। তখন দ্বিপাক্ষিকভাবে এই সমস্যাটিকে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অবগত করেছেন যে এই রোহিঙ্গা সমস্যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। পররাষ্ট্র সচিব তখন মত দিয়েছিলেন যে, এই রোহিঙ্গা সমস্যা সময়ে সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং এর সাথে নিরাপত্তার বিষয়টিও জড়িত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ প্রেক্ষাপটটাকে লিপিবদ্ধ করে মেমো হিসেবে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকদের কাছে পাঠিয়েছিল এবং যার ভিত্তিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দেশনাও পেয়েছিল। তিনি বলেন যে, মন্ত্রিসভায় রোহিঙ্গা সমস্যাটি ২০১২ সালে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপিত ও আলোচিত হয়। ঐ আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিষয়টি নিয়ে আরো গবেষণা এবং পর্যালোচনা করে একটি কৌশলপত্র (strategy paper) জমা দিবে। পরবর্তীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তে একটি কৌশলপত্র মন্ত্রিসভায় পেশ করে। এই কৌশলপত্রটি মন্ত্রিসভায় পেশ করার পর সেটা সভায় পাশ হয় এবং গেজেট (gazette) হয়। এই কৌশলপত্রটিতে রোহিঙ্গা সমস্যার একটা আঙ্গিক তুলে ধরা হয়েছিল এবং একই সাথে রোহিঙ্গা সমস্যা যথার্থভাবে মোকাবেলা করার জন্য পাঁচটি প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছিল। এর আলোকে মন্ত্রিসভায় একটি ফলপ্রসূ আলোচনাও হয়েছিল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যে পাঁচটি প্রস্তাবনা ছিল সেগুলো পররাষ্ট্র সচিব তার আলোচনায় নিয়ে আসেন। পাঁচটি প্রস্তাবনার প্রথমটি ছিল বাংলাদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমার নাগরিকদের জরিপ ও তালিকাভুক্ত করতে হবে। তিনি আশ্বস্ত করে বলেন যে, সাম্প্রতিককালে আবারো নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ শুরু হবার আগেই পুরানো অনুবেশকারীদের এই জরিপে তালিকাভুক্ত করার কাজ শেষ হয়, কিন্তু এটা জনগণকে জানানোর আগমুহূর্তেই নতুন করে আবার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রস্তাবনাটি ছিল তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের মৌলিক চাহিদার সংস্থান করতে হবে। এই প্রথম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদার কথা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনার মধ্যে উঠে এসেছে। তৃতীয়টি ছিল যে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে। এই প্রস্তাবনার ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে- রাস্তা নির্মানসহ বিওপি (BOP) গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বিজিবি-কে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছে। চতুর্থ প্রস্তাবনাটি ছিল মিয়ানমার সরকারের সাথে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা। এই কূটনৈতিক তৎপরতা চলমান ছিল এবং এটাকে অব্যাহত রাখার জন্য মন্ত্রীসভা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুমতি দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি জোর দিতে হবে আর কোন কোন ক্ষেত্রে কম সেটা সম্পর্কেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মন্ত্রিসভা থেকে নির্দেশনা পেয়েছে। এবং পঞ্চমটি ছিল জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা। এই প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব অতীতে সমন্বয়ের অভাবের কথা তুলে ধরেন। তার মতে রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবেলায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় এনজিও এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা সকলেই কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং সেখানে সমন্বয়ের অভাব ছিল। এই অভাব দূর করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা প্রয়োজন হয়। এই প্রস্তাবনার ভিত্তিতে ইতিমধ্যে

সমন্বয়ের জন্য একটি কার্যনির্বাহী দল (Task Force) গঠন করা হয়েছে। জাতীয় কার্যনির্বাহী দলটিতে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং জেলা পর্যায়ে ডিসি (DC) কে নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে আরেকটি কার্যনির্বাহী দল (Task Force) করা হয়েছে এবং সেটা ২০১৩ সাল থেকে কাজ করছে। পররাষ্ট্র সচিব জোর দিয়ে বলেন যে ২০০৮ সাল থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিরবিচ্ছিন্নভাবে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে এসেছে। এ সকল কাজের এবং আলোচনার রেকর্ড আছে এবং ২০০৮ সালের আগেও অনেক কাজ হয়েছে, সেগুলোরও নথি আছে। সুতরাং রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কোন কাজ হয়নি তা বলার কোনো অবকাশ নেই।

গত বছরের শেষের দিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার নিজস্ব গোয়েন্দা সূত্র এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী দলের মাধ্যমে এটা অনুমান করতে পারে যে এই সমস্যাটি আরো প্রকট আকার ধারণ করতে পারে। জাতীয় কার্যনির্বাহী দলে জাতীয় পর্যায়ের গোয়েন্দা সংস্থাসহ প্রায় ২৭টি সংস্থার প্রতিনিধিত্ব আছে। তাদের সবার অনুমান ছিলো যে সমস্যাটি আরো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম চালায়। যার ফলশ্রুতিতে, ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমস্যাটির সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে একটি সারসংক্ষেপ (summary) পাঠায়। সে সারসংক্ষেপের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শক্তিশালী নির্দেশনা প্রদান করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে সারসংক্ষেপ দিয়েছিল তাতে যেসব প্রস্তাবনা ছিল সেগুলোর মধ্যে কিছু প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেখেছিলেন আর কিছু বাদ দিয়েছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি পথ নির্দেশক নীতি (guiding principle) হয়ে দাঁড়ায়। তার পথ নির্দেশক নীতিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে খুবই সাবধানে দ্বিপাক্ষিক কুটনীতি থেকে বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে পরিচালিত হতে নির্দেশনা দেয়। পররাষ্ট্র সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাটির কিছু অংশ সবার জন্য পড়ে শোনান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাটির কিছু অংশ এমন ছিলঃ

বন্ধুত্ব বজায় রেখে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থাৎ যখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কূটনৈতিকভাবে সমস্যাটিকে সমাধানের জন্য চেষ্টা করবে তখন তাদের খুবই সতর্কতার সাথে বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে যাতে করে কোনোভাবেই মিয়ানমারের সাথে সম্পর্কের অবনতি না হয়।

সুতরাং ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাটির প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক যোগাযোগ নীতিতে সতর্কতার সাথে বহুপাক্ষিক কূটনীতির বিষয়টিও যোগ করে। ২০১৬ সালের অক্টোবরে মিয়ানমার থেকে হঠাৎ করে বড় ধরণের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ শুরু হয় যেটা তখন জাতিসংঘের হিসেবে প্রায় ৮৭ হাজার ছিলো। তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক যোগাযোগের নীতিকে আরো শক্তিশালী ও সংহত করে। অন্যদিকে মিয়ানমারও তাদের অবস্থান সম্পর্কে একটি পরিস্কার ধারণা দিলো, যাতে এ অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশি নাগরিক বলে দাবী করে মিয়ানমার তাদেরকে বাংলাদেশী সন্ত্রাসী এবং তারা মিয়ানমারে এসে সমস্যা সৃষ্টি করতে চায় বলে প্রচারণা চালাতে শুরু করে। রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে অবৈধভাবে ঢুকে পড়েছে এবং তারা মিয়ানমারের অবৈধ অধিবাসী-এ ধরণেরও একটা নেতিবাচক ধারণা মিয়ানমার সরকার দেয়ার চেষ্টা করে। মিয়ানমার জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনেও তাদের নেতিবাচক প্রচারণার একটা কপি প্রদানে পররাষ্ট্র সচিব বিস্ময় প্রকাশ করেন। মিয়ানমার সরকারের উল্লেখিত পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটা অনুমান করছিল যে মিয়ানমার তাদের সেনাবাহিনীর মাধ্যমে একটা শক্ত অবস্থানে যাবে। এর উত্তরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে এবং জাতিসংঘের কাছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের অবস্থান পরিস্কার করেছিল এবং এই কাজটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনেক আগে থেকেই করে আসছিলো। সুতরাং পরারাষ্ট্র সচিব আবারো জোরালোভাবে বলেন যে এ ব্যাপারে কারো মনেই সন্দেহ থাকা উচিত না যে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ শুধু সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশের পরেই তার সমস্ত কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে, বরং অনেক আগে থেকেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে আসছে।

তৃতীয়ত, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেহেতু বাংলাদেশের অবস্থান আগেই তুলে ধরেছে বিশ্বের কাছে, সেক্ষেত্রে সর্বশেষ অনুপ্রবেশের পর বাংলাদেশের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে এবং জাতিসংঘে বিশ্ব জনমত গঠনে সহায়ক হয়েছে। বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে যেভাবে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে বিশ্বে প্রচারণা চালাচ্ছে তার একটা প্রভাব পড়েছে জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ

অধিবেশনে । যেখানে ফরাসি রাষ্ট্রপতি মিয়ানমারের এই সামরিক অভিযান এবং রোহিঙ্গাদের নির্বিচারে হত্যাকে "গণহত্যার" সামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । এটা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সাফল্য । কারণ ফরাসি রাষ্ট্রপতির এই বক্তব্য গোটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি অবলম্বনের নির্দেশনা বাংলাদেশের জন্য খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে পররাষ্ট্র সচিব মনে করেন । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ছিল, যেহেতু মিয়ানমার বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিবেশী সেহেতু তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণলায়কে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

পররাষ্ট্র সচিব তার আলোচনায় ৭২তম জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ভাষণের কিছু অংশ পড়ে শোনান । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সূচনা বক্তব্যে বলেছিলেন, "I have come here with a heavy heart. I have come here just after seeing the hungry, distressed and hopeless Rohingyas from Myanmar who took shelter in Cox's Bazar, Bangladesh. This forcibly displaced people of Myanmar are fleeing an 'ethnic cleansing' in their own country where they have been living for centuries." "আমার হৃদয় আজ দুঃখে ভারাক্রান্ত । কেননা আমার চোখে বারবার ভেসে উঠছে ক্ষুধার্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের মুখচ্ছবি । আমি মাত্র কয়েকদিন আগেই আমার দেশে আশ্রয় নেয়া লাখ লাখ রোহিঙ্গার সঙ্গে দেখা করে এসেছি যারা 'জাতিগত নিধনের' শিকার

হয়ে আজ নিজ দেশ থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত । রোহিঙ্গারা বহু বছর ধরে মিয়ানমারে বসবাস করে আসছে" । মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সূচনা বক্তব্যে "জাতিগত নিধনের" কথা বলেছেন । এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি শক্তিশালী মতামত এবং অবস্থান প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে । পররাষ্ট্র সচিব আরো বলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন । পররাষ্ট্র সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহও গোলটেবিলে উপস্থিত সবাইকে পড়ে শোনান । প্রস্তাবসমূহ হলোঃ প্রথমত, অনতিবিলম্বে এবং চিরতরে মিয়ানমারে সহিংসতা ও জাতিগত নিধন নিঃশর্তে বন্ধ করা; দ্বিতীয়ত, অনতিবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘ মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধান দল (Fact Finding Mission) প্রেরণ করা; তৃতীয়ত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান করা এবং এ লক্ষে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় (safe zone) গড়ে তোলা; চতুর্থত, রাখাইন রাজ্য হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত সকল রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘর-বাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা; এবং পঞ্চমত, কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত, পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা । পররাষ্ট্র সচিব আলোচনায় সবাইকে জানান যে, বাংলাদেশ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে সেটা ইতিমধ্যে জাতিসংঘে জমা দিয়েছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের প্রধানদের সাথে যখন কথা বলেছেন তখন এই পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহের কথা বলেছেন। পররাষ্ট্র সচিব বলেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সমাপ্তির সাথে সাথে কাজ থামিয়ে রাখেনি। বরং জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন শেষ হওয়ার পর পরই জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের পাঁচ স্থায়ী সদস্যকে সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে এবং তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। একই সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকেও বিস্তারিত জানানো হয়েছে। পররাষ্ট্র সচিব আশা প্রকাশ করেন যে ১৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে এ ব্যাপারে একটা বড় সিদ্ধান্ত হবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা ট্রেড মিশন (trade mission) মিয়ানমারে যাবার কথা ছিলো যেটা কিনা একদম সর্বশেষ স্তরে ছিলো এবং একটা চুক্তি হওয়ারও কথা ছিল যেটা ছিল জিএসপি প্লাস (GSP Plus)। কিন্তু ইইউ বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে সেটা আপাতত স্থগিত রেখেছে। সুতরাং তারা এই রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। একই সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চীন, রাশিয়া এবং ভারতের সাথে রোহিঙ্গা সমস্যাটি সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে সেটিও সবাইকে আবারো মনে করিয়ে দেন পররাষ্ট্র সচিব। দুই বছর আগে থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই দেশগুলোর সাথে কাজ করা শুরু করে। এমনকি মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বেক্সটার প্রতিবেদন এবং সর্বশেষ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি নন-পেপার (non-paper) তৈরি করেছে এবং বাংলাদেশের অনেক বন্ধুপ্রতিম দেশকে এ নন-পেপার দুই বছর আগেই দেয়া হয়েছে। এই প্রচারণার উপর ভিত্তি করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনেকগুলো কৌশলপত্র (policy paper) তৈরি করেছে। এই সব কিছুর ফলাফল ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে বলে পররাষ্ট্র সচিব আশা প্রকাশ করেন।

চতুর্থত, পররাষ্ট্র সচিব রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান কি হতে পারে সেই প্রসঙ্গে বলেন যে, এই ধরণের সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া খুব সময়সাপেক্ষ হয়। পৃথিবীর সব জায়গায় এমনটা হয়। এটাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই সমস্যার বয়স তিন দশক হয়ে গেছে। পররাষ্ট্র সচিব তার আলোচনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে এবং সরকারের তরফ থেকে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে সকল রকমের প্রচেষ্টা চালানোর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

উন্মুক্ত আলোচনা

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এজাজুল বার চৌধুরী, এনডিইউ, পিএসসি, মহাপরিচালক (অপারেশন্স এবং পরিকল্পনা), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, তার বক্তব্যে বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের উপর বিশদ আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী উদ্ভূত সঙ্কট এর সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত হয় ২৭ আগস্ট ২০১৭ থেকে যখন মালয়েশিয়া সর্বপ্রথম অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের জন্য তাদের সামরিক বিমানের মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর আশ্বাস প্রদান করে এবং তাদের বাহিনীর উচ্চ পদস্থ তিনজন কর্মকর্তার ভ্রমণের বিষয়ে অবহিত করেন। পরবর্তীতে ১৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন কর্মকান্ডে সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সকল কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ করা, পরিবহন করা এবং নিরাপদে জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা; অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের জন্য উখিয়াতে আশ্রয় শিবির নির্মাণে সহযোগিতা করা এবং ত্রাণ ও আশ্রয় নির্মাণের প্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা। পরবর্তীতে ত্রাণ বিতরণ কর্মকান্ডে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হলে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেও ত্রাণ বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ত্রাণ বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে এবং তাদের কাজের মাধ্যমে উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ বিতরণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বিকল্প রাস্তা তৈরির সাথেও নিয়োজিত আছে। সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে প্রায় ৫,০০০ টন ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ করেছে এবং তা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ নিশ্চিত করেছে।

সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এজাজুল বার চৌধুরী বলেন, আশ্রয় এলাকায় সমন্বয় সাধনের জন্য সেনাবাহিনী একটি চেক পয়েন্ট স্থাপন করেছে যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ত্রাণসামগ্রী হার্বারে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে হার্বার থেকে ত্রাণ সামগ্রী প্রতিটি আশ্রয় শিবিরে স্থাপিত সমন্বয় কেন্দ্রের মাধ্যমে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি নৌ ও বিমান বাহিনী চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং বিমান বন্দরে বিভিন্ন দেশ থেকে জাহাজ এবং উড়োজাহাজ যোগে আগত ত্রাণসামগ্রী গ্রহণ করে গুদামজাতকরণ ও তালিকাভুক্তকরণ এর কাজে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তাদের সহিত নিযুক্ত রয়েছে। সেনাবাহিনী উক্ত ত্রাণসমূহ গ্রহণ করে যথাযথ যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে তা জেলা প্রশাসকের কাছে হস্তান্তর করছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৬,০০০ মেট্রিক টন ত্রাণ জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে আছে যা রোহিঙ্গাদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এর পাশাপাশি সেনাবাহিনী উপদ্রুত এলাকায় প্রায় ৯টি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে ২০ হাজার রোহিঙ্গাকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে, যা এখনো অব্যাহত আছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এজাজুল বার চৌধুরী আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, মিয়ানমার সরকার বর্তমান সংকটকে একটি সামরিক রূপ প্রদান করার চেষ্টা করেছিল। যদি এক্ষেত্রে তারা সফলকাম হয়, তাহলে অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের তাদের স্বস্থানে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশের জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়বে। তিনি বর্তমান সংকটকে একটি রাজনৈতিক সংকট হিসেবে আখ্যায়িত করে এর রাজনৈতিক সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে তিনি এখানে বিশেষভাবে

উল্লেখ করেন যে, রাজনৈতিকভাবে মিয়ানমারকে মোকাবিলা করার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ সামরিকভাবে দূর্বল। বরং বাংলাদেশ মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মনিরুল ইসলাম আখন্দ, এনডিসি, পিএসসি, মহাপরিচালক (গোয়েন্দা), সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, তার বক্তব্যের শুরুতেই উল্লেখ করেন যে, মিয়ানমার সরকার নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন, সীমান্তে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ও ট্যাংক মোতায়েনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে রোহিঙ্গা সংকটের সাথে সামরিকভাবে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন এবং সংযম প্রদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন যে, যেকোনো ধরণের সামরিক সংঘাত পুরো ঘটনা থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে প্রবাহিত করবে, যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বর্তমানে মিয়ানমারে পরিচালিত বর্বরতাকে "গণহত্যা" হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থাপন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ "জাতিগত নিধন" শব্দটি থেকে "গণহত্যা" শব্দটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। আর মিয়ানমারে সংগঠিত সংঘাতকে "গণহত্যা" হিসেবে প্রতিষ্ঠত করতে হলে সেখানে পরিচালিত সকল নারকীয় হত্যাকান্ড, খুন, ধর্ষণ, বর্বরতা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাসমূহকে যথাযথভাবে নথিভুক্ত করতে হবে। যথাযথ প্রমান ব্যতীত এই সহিংসতাকে "গণহত্যা" হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এছাড়া অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের নথিভুক্তিকরণ এবং নিবন্ধনের যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে, তাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সংগঠনসমূহ, যেমনঃ জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার উপরও জেনারেল আখন্দ গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, কিছুদিন পূর্বে মিয়ানমার সরকার তাদের দেশে অবস্থিত বিদেশী কূটনীতিকদের বুথিডং এলাকা পরিদর্শনে নিয়ে গিয়েছিলো। সেখানে মিয়ানমারের ভাষ্যমতে শতাধিক হিন্দু জনগণকে হত্যা করে কবর দেয়া হয়েছে। তারা এটি প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে, মুসলমানরা হিন্দুদের হত্যা করার পর বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু সংঘাতের পর অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা জনগণের মধ্যে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীও আছে এবং তাদের ভাষ্যমতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করছে। তাই যেকোনো ধরণের চক্রান্তের ব্যাপারে তিনি সকলকে সতর্ক থাকার আহবান জানান।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আখন্দ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ২৫ আগস্টের সংঘাতের পর মিয়ানমার সেনাবাহিনী সীমান্তে স্থল মাইন স্থাপন করেছে। তিনি এই ঘটনাটিকে আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী উল্লেখ করে বলেন যে, এতে করে মানুষের পাশাপাশি অনেক বন্য প্রাণীরাও যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি পরিবেশেরও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। তাছাড়া রেজিস্টার না করে স্থল মাইন স্থাপন করলে পরবর্তীতে ডি-মাইনিং এর সময় জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের নিবন্ধনের বিষয়টি উল্লেখ করে জেনারেল আখন্দ বলেন যে, কিছু কিছু রোহিঙ্গা যারা পূর্বে অনুপ্রবেশ করেছিল তারা স্থানীয় কিছু নেতাদের সহযোগিতায় নতুন প্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের নিবন্ধনের কাজে বাধা প্রদান করছে। অপরদিকে মিয়ানমার সরকার দাবি করছে যে, তারা শুধুমাত্র সেই সব রোহিঙ্গাদের ফেরত নিবে যারা নিজেদের মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করতে পারবে। এই প্রেক্ষাপটে নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় এটি বাংলাদেশের জন্য প্রমাণ করা দুরুহ হবে যে অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক। মিয়ানমার সরকারের ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে জেনারেল আখন্দ বলেন, এই আইন অনুযায়ী মিয়ানমারে তিন ধরণের নাগরিক রয়েছে; রোহিঙ্গারা যার কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়। রোহিঙ্গাদের নিজ আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তনের জন্য এই আইন পরিবর্তন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে "চরমপন্থি মুসলিম সন্ত্রাসী"

এবং "চরমপন্থি বাঙ্গালী সন্ত্রাসী" হিসেবে আখ্যায়িত করছে। যদিও এই সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মিয়ানমার সরকারের নিকট আপত্তি জানিয়েছে, তথাপি মিয়ানমার সরকার নিয়মিতভাবে অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অপবাদ দিয়ে আসছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মনিরুল ইসলাম আখন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মিয়ানমার সরকার হয়তো পুরো ঘটনাটিকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে আখ্যায়িত করে বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিকভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাবে। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলাদেশকে অবশ্যই সতর্ক অবস্থানে থাকতে হবে এবং এই সমস্যার যেকোনো সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

মেজর জেনারেল আবুল হোসেন, এনডিসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখ থেকে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ শুরু হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো যে এই অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে তাদের জন্য নির্ধারিত শিবিরে থাকার অনুমতি প্রদান করা হয়। তিনি এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণের মানবতাবাদী চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উপরন্তু, তিনি বর্তমান সরকারের বিভিন্ন দূরদর্শী সিদ্ধান্তেরও প্রশংসা করেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি খুব সহজে স্বাভাবিক রূপ লাভ করবে না। কারণ মিয়ানমার সরকারের পাশাপাশি প্রায় আট লক্ষ বৌদ্ধ উগ্রবাদী নাগরিক মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে সহিংসতা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে যাচ্ছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে মেজর জেনারেল আবুল হোসেন বলেন যে, মিয়ানমার সেনাবাহিনী তাদের একটি মাইনার্স ফোর্স এর দলকে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মোতায়েন করেছে। এছাড়া সেনাবাহিনী সংকটের শুরু থেকেই বিভিন্ন ধরণের উস্কানিমূলক আচরণ করে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সীমান্ত রক্ষা বাহিনী সংযম প্রদর্শন করে আসছে। যার ফলশ্রুতিতে যেমন যেকোনো ধরণের সামরিক সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়েছে তেমনি কূটনৈতিক সাফল্যও অর্জিত হয়েছে।

মেজর জেনারেল আবুল হোসেন উল্লেখ করেন যে, মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বহুদিন থেকেই দাবি করে আসছিলো যে বাংলাদেশ থেকে আগত দুস্কৃতিকারীরা মিয়ানমারে প্রবেশ করে তাদের সীমান্ত চৌকিতে হামলা চালিয়ে আসছে। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে যৌথ টহলের প্রস্তাব জানিয়ে এসেছে যাতে মিয়ানমার কোনো ধরনের সাড়া প্রদান করেনি। যার ফলে মিয়ানমার আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তাদের উল্লিখিত দাবির প্রতি কোনো সমর্থন আদায় করতে পারেনি। মেজর জেনারেল আবুল হোসেন এই বিষয়টিও বাংলাদেশের একটি কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে তিনি মনে করেন যে, বাংলাদেশের যে স্ট্রাটেজি পেপার আছে সেটিকে আরো পরিমার্জিত করা প্রয়োজন। বিজিবির মহাপরিচালকের ভাষ্যমতে মিয়ানমার যেহেতু বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, তাই তাকে উপেক্ষা করার বা অগ্রাহ্য করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি পরামর্শ দেন যে, ব্যক্তি পর্যায়েও যদি এই দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের মত সুযোগ থাকে, তবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত। তিনি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে তৈরি সংকটে চীন, ভারত ও রাশিয়ার মত প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন আদায়ের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। জেনারেল হোসেন রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় এবং অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের সাহায্যার্থে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, সব ক্ষেত্রেই উন্নতি সাধনের অবকাশ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, রোহিঙ্গাদের জন্য যেসব শিবির স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো এখনো তেমন থাকার উপযোগী নয়। শিবিরগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা, খাবার পানি, স্যানিটেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবন রক্ষাকারী উপাদানসমূহের ঘাটতি রয়েছে। এসব বিষয়ের উপর এখনই গুরুত্ব আরোপ

করা না হলে অদূর অবিষ্যতে তা বড় সমস্যায় রূপান্তরিত হবে। তিনি শিবিরে খাদ্য সরবরাহের দিকেও সরকারের যথাযথ নজর রাখার আবশ্যকতা তুলে ধরেন। তাছাড়া সীমান্ত রক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের সক্ষমতা আরো বাড়াতে হবে বলে মেজর জেনারেল আবুল হোসেন মনে করেন।

রাষ্ট্রদূত মাহমুদ হাসান মনে করেন যে, বর্তমান রোহিঙ্গা সংকটের দুটি পক্ষ রয়েছে, এক পক্ষ হচ্ছে মিয়ানমার এবং অন্য পক্ষ বাংলাদেশ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মিয়ানমারের কৌশল স্পষ্ট, আর তা হচ্ছে সমগ্র রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নিজ দেশে প্রত্যাবাসন যেকোনো উপায়ে যথাসম্ভব দীর্ঘ করা, যার একটি উপায় হচ্ছে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া এবং মিয়ানমার সরকার যদি এই যাচাইকরণ প্রক্রিয়া যেকোনো উপায়ে পরবর্তী দুই বা তিন বছর বর্ধিত করতে পারে, তাহলে তারা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে রাখাইন রাজ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে বিতারিত করার কৌশলে সফলকাম হবে। মিয়ানমার সরকার কৌশলে চাচ্ছে, যেকোনো উপায়ে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে যদি দীর্ঘস্থায়ী করা যায়, তাহলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশী জনগণের সাথে মিশে যেতে পারবে। রাষ্ট্রদূত হাসান মনে করেন যে, এটিই হচ্ছে মিয়ানমার সরকারের মূল উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রদূত মাহমুদ হাসান এর ভাষ্যমতে বেশকিছু বিষয় রয়েছে যার উপর বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। প্রথমত কোনো অবস্থাতেই মিয়ানমার সরকারের 'প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার' ফাঁদে পা না দেয়া। দ্বিতীয়ত, অনতিবিলম্বে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ চার্টারের ৭নং অধ্যায়ের অধীনে রেজুলেশন পাশ করানো। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যকার যেকোন চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, যেসব রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করানো সম্ভব হবে, তাদের নাগরিকত্ব প্রদান নিশ্চিত করা। কারন, যদি তাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্ব প্রদান না করা হয়, কয়েক বছরের মধ্যেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে রাষ্ট্রদূত হাসান আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

পরিশেষে তিনি "আনান কমিশনের" প্রতিবেদন এবং এর সুপারিশসমূহের উপর তার তীব্র আপত্তির কথা উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন যে, মিয়ানমার সামরিক জান্তা আনান কমিশনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মতামতকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য। এই কমিশনের প্রতিবেদনের কোথাও "রোহিঙ্গা" শব্দটির উল্লেখ নেই। তাছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারে নাগরিকত্ব দেয়ার কোনো সুপারিশও এই কমিশনের প্রতিবেদনে করা হয়নি। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে মিয়ানমার সরকার যেন রোহিঙ্গাদের যাচাইকরণ প্রক্রিয়া বেগবান করে এবং অনুরোধ জানানো হয়েছে সরকার যেন ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন পুনরায় বিবেচনা করে। রাষ্ট্রদূত মাহমুদ হাসান মনে করেন যে, এই কমিশনের প্রতিবেদনের কোনই গভীরতা নেই, যা তৈরিই করা হয়েছে শুধুমাত্র মিয়ানমার সরকারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদের মত হীন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। তিনি এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের রিচার্ড হর্শের প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেন, যা তার ভাষ্যমতে ইচ্ছাকৃতভাবে দমিয়ে দেয়া হয়েছে আনান কমিশনের প্রতিবেদনের মাধ্যমে। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন যে, রিচার্ড হর্শের রিপোর্টে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিলো যে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে গুরুতর মানবিকতার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। তিনি আনান কমিশনের প্রতিবেদন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গভীর সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করেন।

রাষ্ট্রদূত এম শফিউল্লাহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকুরীকালীন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, মিয়ানমারে আনুমানিক

১২ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বসবাস করে যাদের মিয়ানমার বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দাবি করে থাকে। কিন্তু এই সংক্রান্ত কোনো প্রতিবাদ লিপি মিয়ানমার বাংলাদেশের কাছে কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেনি। রাষ্ট্রদূত শফিউল্লাহ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, এই সংক্রান্ত কোনো তথ্য বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিকট আছে কিনা। অর্থাৎ মিয়ানমার এখন পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ লিপি হস্তান্তর করেছে কিনা।

রাষ্ট্রদূত শমশের মুবীন চৌধুরী, বীর বিক্রম, প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব, মনে করেন মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা সংকট ইচ্ছাকৃতভাবে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ইতিমধ্যে গুটিকয়েক পাশ্চাত্য দেশের সরকার সমস্যা সমাধানের "প্ল্যান বি" এর কথা চিন্তা করেছে। "প্ল্যান বি" হচ্ছে, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম যদি দীর্ঘমেয়াদী হয়, তাহলে বাংলাদেশে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ নিশ্চিত করা। মূলত এটি মিয়ানমার সরকার বহুদিন ধরে চেয়ে আসছে। তিনি পররাষ্ট্র সচিবকে অনুরোধ করেন যে, এই রোহিঙ্গা সংকট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে যেন সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হয়। এতে জনমনে সংকট সংক্রান্ত যেকোনো বিভ্রান্তি বা অমূলক ধারণা থাকলে তা দূরীভূত হবে। তিনি সকলের জ্ঞাতার্থে জানান যে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার চিন্তা করছে। তিনি মনে করেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে মিয়ানমার সরকারকে প্রকাশ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য সমালোচনা করা প্রয়োজন। তিনি রাষ্ট্রদূত মাহমুদ হাসানের সাথে একমত প্রকাশ করে বলেন যে, সংকট নিরসনের যেকোনো কর্মকান্ডে জাতিসংঘকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন, কারণ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সমস্যা ইতিমধ্যেই জাতিসংঘের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের এই অবস্থা থেকে পিছিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই। তিনি মিয়ানমার সরকারের মন্ত্রীর ভ্রমণ পরবর্তী সংবাদ বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, মিয়ানমার চায় এই সংকটের দ্বিপাক্ষিক সমাধান। তিনি আনান কমিশনের প্রতিবেদনের ব্যাপারে রাষ্ট্রদূত মাহমুদ হাসানের সাথে কিছুটা দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন যে আনান কমিশনের প্রতিবেদন হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না, কিন্তু এই প্রতিবেদন সংকটের একটি স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূচনা ফলক হতে পারে।

মেজর জেনারেল (অবঃ) শাহেদুল হক, মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন সামরিক অ্যাটাশে, প্রশ্ন করেন যে, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে যে যৌথ চুক্তি হয়েছিল এবং যার ভিত্তিতে তখনকার রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তন করানো হয়েছিল, বাংলাদেশ সেরকম দিকে যাবে কিনা? এ বিষয়ে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন যে এটাতে যদি সরকার যায়, তাহলে বাংলাদেশ পুনরায় মিয়ানমারের ফাঁদে পড়তে পারে।

মেজর জেনারেল শাহেদুল হক ১৯৭৫ সালের ব্রিটিশ ফরেন অফিসের একটি লিট রিপোর্টের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কায়সার রাষ্ট্রদূত অভরায়নকে বলেছিলেন যে প্রায় ৫ লক্ষাধিক বাংলাদেশী মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ১৯৭০ সাল থেকে বসতি স্থাপন করেছে। যদিও রিপোর্টের শেষে রাষ্ট্রদূত অভরায়ন উল্লেখ করেন যে তিনি রাষ্ট্রদূত কায়সারকে এ সংক্রান্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস বলে মনে করেন না, তথাপি মিয়ানমার সরকার নিয়মিতভাবে তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত কায়সারের করা মন্তব্যটি ব্যবহার করে আসছে।

জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, উল্লেখ করেন যে, কফি আনান কমিশনের প্রথম খসড়াতে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব নিয়ে বেশি কিছু উল্লেখ ছিল না। প্রথম খসড়া হওয়ার পরে, ১২ সদস্যের দলের ৫ জন বাংলাদেশে এসে রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করে গেছেন এবং ফিরে যাওয়ার পরে তারা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করেছেন। সকল অংশীদারদের সহযোগিতায় এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সফলতা। শমশের মুবীন চৌধুরীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন আনান কমিশনের প্রতিবেদন এর সঠিক উদ্দেশ্য ছিল একটি "staggered approach" এর নীতি অন্তর্ভূক্ত করা। কারণ মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ যখন কফি আনান কমিশন গঠন করে দিয়েছে, তখন তাদের মধ্যে অবশ্যই পারস্পরিক বিশ্বস্ততা থাকবে। ঐ প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। কারণ রোহিঙ্গা শব্দটা ব্যবহার করলে, মিয়ানমারের কাছে ঐ প্রতিবেদনের কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। কফি আনান কমিশনের প্রতিবেদনে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে, ১৯৮২ এর নাগরিকত্ব আইনকে সংস্কার করতে হবে।

একটি সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ থেকে গেছে এই ধরনের কোনও নোট ভারবাল মিয়ানমারের কাছ থেকে বাংলাদেশ পায়নি। রোহিঙ্গা সংকট সংক্রান্ত সকল তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ না করাকে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কৌশলগত কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। কারণ, তিনি মনে করেন এই সংকট সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রথম দিন থেকেই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হলে মিয়ানমার আরও বেশি রক্ষণাত্মক (defensive) হয়ে যেত। বাংলাদেশের পক্ষে হয়তো সমস্যাটির কূটনৈতিক সমাধান এর কোন সুযোগই পাওয়া যেত না। আন্তর্জাতিক মহল যে আজকে বাংলাদেশের অবস্থানকে সাধুবাদ জানাচ্ছে, এই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা বাংলাদেশ নাও পেতে পারত। ১৯৯২ সালের চুক্তি থেকে চেতনা নেয়া যাবে, কেননা ওখানে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, তারা মিয়ানমার থেকে আসা মানুষ। এটা একটা ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রেস ব্রিফিং-এর চুক্তি এককভাবে বর্তমান সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। এই কারণে, যখন মিয়ানমারের মন্ত্রী মহোদয় সম্প্রতি বাংলাদেশে সফর করেন তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি সুনির্দিষ্ট খসড়া তাদের কাছে উপস্থাপন করে।

মেজর জেনারেল (অবঃ) শাহেদুল হক এর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের কোন এক রাষ্ট্রদূত কি বলেছেন, সেটা ব্রিটিশ সরকার এখন আর বিবেচনা করে না। ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান অবস্থান থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। অতীতে কোন রাষ্ট্রদূত কোন বিশেষ বিষয়ে কিছু বলতে পারেন। সেটাকে সরকার এখন বিবেচনা করে না। কারণ এখনকার পরিস্থিতিটা ভিন্ন।

জনাব মোঃ শহীদুল হক, পররাষ্ট্র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, উন্মুক্ত আলোচনার প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেন যে, সাড়ে চার বছর আগে তিনি পররাষ্ট্র সচিব হওয়ার পর থেকে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছিল। তখন সবচাইতে বেশি সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা, সেনাবাহিনী এবং বিজিবির নিকট থেকে, বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার সাথে অন্যান্য বিষয়গুলোর সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রথম দিকে তারাও এ ব্যাপারে একটু রক্ষণাত্মক ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রদূত মাহমুদ হাসান এর সাথে একমত পোষণ করেন এবং ১৯৯২ সালের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন,

১৯৯২ সালের ফাঁদে পড়া বাংলাদেশের জন্য ঠিক হবে না। সেজন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিউইয়র্কে একটি লিখিত পেপার তাদের সামনে উপস্থাপন করেন। সেখানে ইউএনএইচসিআর, আইওএম এবং সকল আন্তর্জাতিক সংগঠনের সম্পৃক্ততার কথা পরিষ্কারভাবে বলা আছে, যতদিন পর্যন্ত রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফেরত না যায় এবং তাদের প্রত্যাবাসন সম্পূর্ণ না হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই, তাদের মন্ত্রী যখন সম্প্রতি বাংলাদেশে আসে, তখন ঐ পেপারকে সংস্কার করে তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন ঐ পেপার এর উপর মন্তব্য দেয়। ঐ পেপারের উপর ভিত্তি করে নতুন চুক্তি হবে। বাংলাদেশ ১৯৯২ এর মত কোন চুক্তিকে মেনে নিবে না। মিয়ানমারের ১৯৮২ সালের আইনের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে কিছু সুপারিশমালা আছে। ঐ আইনে নাগরিকত্ব বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ পরিচ্ছেদ আছে। সেজন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে যে, ঐ আইনে ওদের নাগরিকত্বের বিষয়ে বলা আছে, যাতে রোহিঙ্গাদের একবার ফেরত নিয়ে, পাঁচ বছর পর যেন পুনরায় বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে না পারে। তিনি সেখান থেকে শুধু একটি লাইন পড়ে শুনান "the manner in which the law has been applied over the past decades has not done justice to the credible claims of community who have been living in the country for generation." তিনি বলেন, এটা শুধুমাত্র একটি বাক্য হলেও এর ভিতরে অনেক কিছু নিহিত আছে।

কফি আনান কমিশনের প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আনান কমিশনের প্রথম প্রতিবেদনটা ছিল খুবই দুর্বল। তাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জেনেভায় কফি আনানের অফিসে তাদেরকে তাগাদা দেয়া হয়েছে। কফি আনান কমিশনের সদস্যরা যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন, তখনও তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি যেন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রদূত তাদের কাছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার উপস্থাপন করেন। ঐ ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারের অনেক কিছুই আনান কমিশনের ঐ প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ঐ পরিস্থিতিতে এটাই ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম করণীয় এবং এটা আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমশের মুবীন চৌধুরীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বলেন যে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের স্থানীয় জনগণের সাথে মিশে যাওয়ার ব্যাপারে সরকার পুরোপুরি সচেতন এবং এই জন্যই সরকার এখনও তাদেরকে শরনার্থী হিসেবে স্বীকার করে নাই। আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদেরকে "বলপূর্বক/জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক" বলা হচ্ছে। তাদেরকে যে মিয়ানমার থেকে বলপূর্বক/জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে সেই ধারণাটি যাতে থাকে সেজন্যই 'বলপূর্বক' বলা হচ্ছে এবং তারা যে মিয়ানমারের নাগরিক সে ধারণাটি যাতে থাকে সেজন্যই মিয়ানমার শব্দটি রাখা হয়েছে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ যেহেতু রোহিঙ্গা শব্দটি স্বীকার করে না, তাই রোহিঙ্গা শব্দটি ব্যবহার না করে মিয়ানমারের নাগরিক বলা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন পররররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চায় সবাই যেন এই নামকরণটা ব্যবহার করে।

রাষ্ট্রদূত সিএম শফি সামি, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব, গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিআইআইএসএস-কে ধন্যবাদ জানিয়ে তার আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন এই ধরনের গোলটেবিল আলোচনার উদ্যোগ জাতীয় নীতি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তিনি উল্লেখ করেন সরকারের অনেক উদ্যোগ সবসময় প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হয় না। বিশেষ করে কূটনৈতিক উদ্যোগ পরিচালনা করা হয় নীরবে, নিভৃতে। সেই প্রচেষ্টা সাফল্যের জন্যই। কিন্তু তার মানে এই না যে, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলছে না। আজকে পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্যের মাধ্যমে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অনেক কিছুই জানা সম্ভব হয়েছে। যেগুলো হয়তো আগে বলা সম্ভবপর ছিলোনা, এখন সময় এসেছে তাই বলেছেন। তাই সরকারের বিভিন্ন নীতির পর্যালোচনা করার সময় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে যে বক্তব্য দিয়েছেন

তা অত্যন্ত জোরালো, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন বক্তব্য। তিনি বিশ্বাস করেন যে, ঐ বক্তব্য প্রণয়নে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। এজন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তিনি ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন ফরাসী প্রেসিডেন্ট যে এটাকে 'গণহত্যা' বলেছেন, এটা এখন অনেকেই বলছেন। তিনি এই শব্দটি প্রতিষ্ঠিত করার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা শুধুমাত্র বাংলাদেশের বা মিয়ানমারের সমস্যা নয়, এটি একটি মানবিক সমস্যা, আঞ্চলিক সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা। এই সমস্যা মোকাবেলায় মানবিক মূল্যবোধ, আন্তর্জাতিক আইন এবং নীতির ভিত্তিতে সমস্ত আন্তর্জাতিক মহলে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইতিমধ্যে পশ্চিমা দেশগুলোর পক্ষ থেকে একটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এই চাপ সৃষ্টিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক ভূমিকা ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

রাষ্ট্রদূত শফি সামি বলেন বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করেছে। এটা অনেক ভাল দিক। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে খেয়াল রাখতে হবে যে, এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মিয়ানমার যেন তাদের উপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রশমন করার সুযোগ না পায়। এই ব্যাপারে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সজাগ থাকার পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন বাংলাদেশের দুই প্রতিবেশী প্রভাবশালী দেশকে (ভারত ও চীন) আরও কাছে নিয়ে আসতে হবে, যেহেতু মিয়ানমারের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মিয়ানমারের উপর প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রভাব আছে। তারা এই প্রভাবকে ব্যবহার করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই সমস্যার সমাধানে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এই দুই দেশ অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিবেশী দেশগুলোকে বুঝাতে হবে যে, এই রকম নৃশংসতা, গণহত্যা, জাতিগত নিধন যেসব অঞ্চলে চলে, সেই অঞ্চলগুলো মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদে জড়ানোর জন্য উর্বর হয়ে যায়। সন্ত্রাসবাদের এই সম্ভাব্য উত্থান মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের জন্যই বিপদজনক। একই সাথে সন্ত্রাসবাদের এই উত্থান আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিপদজনক। এই উপলব্ধি যদি আন্তর্জাতিক মহল এবং এই অঞ্চলের সব দেশের আসে, তাহলে বেশ কিছু সাফল্য আসতে পারে এবং এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম সাখাওয়াত হোসেন, এনডিসি, পিএসসি, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার, রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে এত খোলামেলাভাবে আলোচনা করার জন্য এবং তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিআইআইএসএস-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন রোহিঙ্গা বিষয়ে তার খুব বেশি অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু ১৯৯২ সালে তিনি 'অপারেশন নাফরক্ষা' এর ফোর্স কমান্ডার ছিলেন। ঐ সময়ে মোটামুটি একটা সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। যদিও কোনও সংঘাত হয় নাই। বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার সংঘাত এড়িয়ে যায়। সেই সময়ে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর মূল অংশ ঐখানে ছিল না। তখন শুধুমাত্র নাসাকা বাহিনী ছিল। এখন সেখানে ওয়েস্টার্ন কমান্ড, এন-এ আছে। যেটা মিয়ানমারের একটি অন্যতম মূল অংশ। উত্তরে একটি কোর আছে, যার নাম নর্থ ওয়েস্টার্ন কোর এবং দক্ষিণে একটি কোর আছে, যার নাম সাউথ ওয়েস্টার্ন কোর। তাই রাখাইন অঞ্চলে এখন তিনটি কোর এবং তিনটি কমান্ড আছে।

তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে এখন কৌশলগত বিভাজন শুরু হয়েছে, পূর্ব এবং পশ্চিমের ভিতরে। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য তিনি সুপারিশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন রোহিঙ্গারা শুধু বাংলাদেশেই নয়, তারা আরও পাঁচটি দেশে আছে। ঐ রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে মিয়ানমারের উপরে আরোও বেশি চাপ প্রয়োগ করার জন্য তিনি মন্ত্রী মহোদয়কে সুপারিশ করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ঐ সমস্ত দেশের কাছেও রোহিঙ্গারা একটা সমস্যা। তিনি বলেন দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর উপর চাপ প্রয়োগ

করা। তিনি মন্তব্য করেন যে, তিন জন জেনারেল এই সমস্যার জন্য দায়ী, মিয়ানমারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সীমান্ত মন্ত্রী এবং কমান্ডার ইন চীফ। এ ছাড়াও তিনি বলেন মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও দায়ী। এ বিষয়ে তিনি বলেন যে, মিয়ানমারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী একজন জেনারেল এবং তার উপ-প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও একজন জেনারেল। তাই এসব জেনারেলদের উপর চাপ প্রয়োগ করা দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জেনারেল সাখাওয়াত বলেন সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে দুই জন রোহিঙ্গাকে জঙ্গি হিসেবে মিয়ানমারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। যেটা বাংলাদেশের জন্য মিয়ানমারের ফাঁদে পা দেওয়ার মত বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন এ বিষয়টি সরকারের ভেবে দেখা দরকার। মিয়ানমার তার সীমান্তে যে স্থল মাইন পুঁতে রেখেছে সেই ব্যাপারেও জোরালো প্রতিবাদ হওয়া দরকার। রোহিঙ্গাদের ভিতরে যে এতিম শিশুরা আছে তাদের ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। এদের সঠিকভাবে যত্ন না নিলে, ভবিষ্যতে এরা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, এমিরিটাস অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রোহিঙ্গা সমস্যাকে একটি বহুমাত্রিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য পররাষ্ট্র সচিবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে পাঁচটি দৃষ্টিকোণ থেকে রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করেন।

তার প্রথম দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে তিনি বলেন, এই সংকটের পাঁচটি মাত্রা আছে। প্রথমটিঃ মানবিক; দ্বিতীয়টিঃ কূটনৈতিক; মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে, তা বাংলাদেশ অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং প্রজ্ঞার সাথে কূটনৈতিক পন্থায় দ্বিপক্ষীয় পদ্ধতিতে সমাধান করার চেষ্টা করছে; তৃতীয়টিঃ অর্থনৈতিক; বাংলাদেশের উপর অর্থনৈতিক প্রচন্ড চাপ রয়েছে। যেখানে রোহিঙ্গারা আশ্রয় নিয়েছে জিনিস পত্রের দাম প্রচন্ড বেড়ে গেছে। এছাড়া রোগ ও মহামারি ছড়িয়ে পড়ার আশংকা আছে ওখানে; চতুর্থটিঃ নিরাপত্তাজনিত সংকট; এ সংকটের ফলে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার উভয় রাষ্ট্রে আঞ্চলিকভবে উগ্রবাদ ছড়িয়ে পড়ার আশংকা আছে। যার প্রভাব আন্তর্জাতিকভাবেও পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে; এবং পঞ্চমটিঃ পরিবেশগত সমস্যা; রোহিঙ্গারা যে স্থানগুলোতে আছে সেখানে ইতিমধ্যে পরিবেশের বিপর্যয় শুরু হয়েছে। এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণটি হলো বর্তমান সংকটের সূচনা ২০০৪ সাল থেকে, যে সময় রাখাইন এলাকায় ব্যাপক এবং বিপুল খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নতমানের ইউরেনিয়ামও পাওয়া গেছে। তারপর থেকে মূলত ভারত এবং চীন মিয়ানমারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ হিসেবে কাজ করছে। যদিও রাশিয়া অনেক আগে থেকেই মিয়ানমারে অস্ত্র সরবরাহ করে আসছিল। ২০০৮ সালে মিয়ানমার সরকার প্রকল্প গ্রহণ করল যে, ঐ এলাকাকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং ঐ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩ তে সিদ্ধান্ত হল যে রাখাইন এলাকাকে জনশূন্য করতে হবে। বর্তমান মিয়ানমার সেনবাহিনীর ৩৩ এবং ৯৯ পদাতিক বাহিনী ঐ এলাকার দায়িত্ব পালন করছে এবং তাদের অভিযানের নাম হল 'অপারেশন এরিয়া ক্লিয়ারেন্স'। এই দুই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র হত্যা করার জন্য, কোন মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি।

তৃতীয় দৃষ্টিকোণটি হলো বাংলাদেশ সরকার এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত যা কিছু করেছে তার জন্য তিনি অভিনন্দন জানান এবং ১৯৯২ এর চুক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে এটি কোন ভাবেই বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। কারণ এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে, কাজেই এখন নতুন চুক্তির প্রয়োজন। ১৯৯২ সালের চুক্তি থেকে শুধু চেতনা নেয়া যাবে। বাংলাদেশ সরকার যা করেছে তার সাথে তিনি দুইটি বিষয়কে সংযোজন করার আহবান জানান। প্রথমতঃ বাংলাদেশ সরকারীভাবে ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে তিনটি দেশে (ভারত, চীন ও

রাশিয়া) এবং যে সমস্ত দেশে রোহিঙ্গারা শরণার্থী হয়ে আছে সেই সমস্ত দেশে পাঠাতে পারে, যিনি রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টি দেশগুলোকে বোঝাবেন এবং কিভাবে এ সংকট সমাধান করা যায় এ ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করবেন। দ্বিতীয়তঃ সরকারের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি করা দরকার যেটির কথা ইতিমধ্যে পররাষ্ট্র সচিবও বলেছেন, যেটির ইংরেজি নাম হতে পারে 'Task Force' যার বাংলা অর্থ হচ্ছে 'কর্ম সম্পাদন কমিটি'। বিভাগীয় একটি কমিটি হতে পারে এবং বিশেষ পর্যায়ে একটি কমিটি হতে পারে যেখানে সুশীল সমাজের সদস্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদস্য, সেনাবাহিনীর সদস্য থাকতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে এই বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিবেন।

চতুর্থ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের রোহিঙ্গা নীতি সম্পর্কিত সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা উচিত। পঞ্চম দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, বাংলাদেশ যে আন্তর্জাতিক কূটনীতি পরিচালনা করছে সেখানে একটি কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা দরকার যে, রোহিঙ্গা সংকটটির সমাধান সবার জন্য প্রয়োজন। বাংলাদেশের জন্য যেমন প্রয়োজন, মিয়ানমারের জন্যও প্রয়োজন এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জন্যও প্রয়োজন। দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য এই সংকটের আশু সমাধান করা দরকার। এই যুক্তিটি বাংলাদেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন ভারত যদিও প্রথম দিকে মিয়ানমার সরকারকে সমর্থন করেছে। কিন্তু ইদানিং কালে ভারত সবচেয়ে বেশি ত্রাণ পাঠিয়েছে। ভারত মিয়ানমারকে সামরিক অভিযান বন্ধের আহবান জানিয়েছে। ভারতও রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠতে চায়। বাংলাদেশও রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠতে চায়। এ ক্ষেত্রে, দুই দেশের স্বার্থ এক। এই যুক্তি বাংলাদেশের সবার কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন।

জনাব সাহাব এনাম খান, সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্যে পররাষ্ট্র সচিবের নতুন দিল্লী সফরের কথা স্মরণ করেন এবং রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল পদক্ষেপের একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেয়ার জন্য পররাষ্ট্র সচিবকে ধন্যবাদ জানান। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সফল হবে এই ব্যাপারে তিনি তার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন বাংলাদেশ সরকার সঠিক পথে এগুচ্ছে। জনাব সাহাব এনাম খান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এজাজুল বার চৌধুরী এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মনিরুল ইসলাম আখন্দ এর সাথে একমত পোষণ করে তার আলোচনায় আরো কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন।

তাঁর মতে রোহিঙ্গা সমস্যাটাকে সংজ্ঞায়িত করতে যেয়ে এর বহুস্তর, বহুবিধ জটিলতাতে যে সন্দেহটা থেকে যায় এবং যেটা পররাষ্ট্র সচিবের কথায়ও উঠে এসেছে, তা হলো রোহিঙ্গাদেরকে কি 'শরণার্থী' বলা হবে না 'বাস্তুচ্যুত' বলা হবে এই প্রাথমিক বিষয়গুলো প্রথমে পরিষ্কার করে নেয়া উচিত। তার মতে প্রথমত, এই বিষয়গুলো যদি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে বিষয়গুলো সবার কাছে আরো পরিষ্কার হবে, যা বাংলাদেশের অবস্থানকে আরো বেশি শক্তিশালী করবে। দ্বিতীয়ত, তার মতে বাংলাদেশ সরকার যদিও সঠিক পথে এগুচ্ছে কিন্তু তার পরেও একটি সমন্বিত যোগাযোগ নীতি (communication policy) থাকা দরকার। বাংলাদেশ সরকারের এখন কোনো যোগাযোগ নীতি নাই এবং কোনো সমন্বিত নীতি নাই। এটার দুর্ভাগ্যজনক উদাহরণ হিসেবে রাজনৈতিক বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের এই বিষয় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বা মন্তব্য প্রদানকে উল্লেখ করেন তিনি। তার মতে এই ভুল ব্যাখ্যার বিরূপ প্রভাব পড়ে কূটনীতিতে কারণ অন্যান্য রাষ্ট্র এইসব ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করে। তাই পররাষ্ট্রনীতিতে ভুল করার সুযোগ কম থাকে। তাতে করে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই একটি বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক ভিন্ন ভিন্ন মতের ফলে যে বিভেদ তৈরি হয় সেটা যাতে না হয় সেই জন্য একটা সমন্বিত নীতি থাকা দরকার।

তৃতীয়ত, তার মতে বাংলাদেশের সামরিক ব্যবস্থা যেটুকু থাকার কথা সেটুকু অবশ্যই আছে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থান এমন একটা জায়গায় যেটাকে বলা যায় প্রহেলিকা বেষ্টিত ভূ-কৌশলগত অবস্থান (riddle wrapped

geostrategic position)। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান অনেকটা এরকম একটি জায়গার মতো। এই জায়গাটার জনতাত্ত্বিক বিষয় (demographic genetics) যেটা আছে সেটাও বিবেচনায় আনতে হবে। ফলে ভবিষ্যতে জাতিগত দ্বন্দ্বের যে সম্ভাবনা আছে সেগুলোকেও বোঝা যাবে। মিয়ানমার এখন যেসব বর্ণনামূলক প্রতিবেদন দিচ্ছে বা বেক্সটার প্রতিবেদন যেটা ১৯৪০ সালে ছাপা হয় এবং ১৯৪১ সাল থেকে এটা কার্যকর হয় এবং ১৯৩৫ সালের বার্মা আইন এর সেকশন ১৪৪-এ যে জনতাত্ত্বিক বিষয়ের কথা বলা হয়েছে সেগুলোর একটা প্রভাব মিয়ানমারের কর্মকান্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। তার মতে এই জনতাত্ত্বিক বিষয়গুলো সবাইকে বুঝতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি মনে করেন যে এই বিষয়গুলো নিয়ে এটা সমন্বিত আলোচনা দরকার আছে। এছাড়াও তিনি ইউরেশিয়ান ঐক্যের ব্যাপারে তুরস্কের কথা বলেছেন। আবার তিনি বল্কানাইজেশনের ব্যাপারেও বলেন যে এই সমস্যাটা একটা বল্কানাইজেশনের সৃষ্টি করতে পারে। তার মতে এটার ফলে একটা আর্ক অব ইন্সটেবিলিটির প্রভাবে অনেক দেশের জন্য এটা সুইস স্পট হতে পারে আবার চীনের জন্য এটা ডার্ক স্পট হতে পারে। তার মতে এইসব বিষয়গুলোকে চিন্তা করে বাংলাদেশের কৌশলগত জবাবটাও তৈরি করতে হবে। তার জন্য একটা কানেক্টিভিটি তৈরি করতে হবে এবং এটার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পররাষ্ট্রনীতির দিকে যেতে হবে এছাড়াও তিনি আমলাতান্ত্রিক প্রস্তুতির উপরও গুরুত্ব দেন। এখানেও একটা সমন্বয় থাকতে হবে। তার মতে শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক না বরং বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে মোমেন্টাম ধরে রাখা সবচেয়ে বেশি জরুরি যেটা খুব কঠিন কাজ। এছাড়াও আর্লি ওয়ার্নিং প্রসিডিউরের (early warning procedure) এর উপর ভিত্তি করে তিনি আমলাতান্ত্রিক প্রস্তুতির উপরও গুরুত্ব দেন। তিনি একটা সমন্বিত সেল (coordination cell) তৈরি করার কথাও উল্লেখ করেন যেটা শুধুমাত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েই থাকবে না বরং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অথবা ফোরসেস ডিভিশনেও থাকবে।

ড. সি আর আবরার, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং বিআইআইএসএস-কে এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করার জন্য সাধুবাদ জানিয়ে তার আলোচনা শুরু করেন। তাঁর মতে রোহিঙ্গা সমস্যা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ যেটা বাংলাদেশকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে এবং বাংলাদেশ এই কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারছে যেখানে অন্যান্য দেশ বিভিন্ন অজুহাতে বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছে। এর জন্য তিনি সরকারের প্রশংসা করেন। তিনি পররাষ্ট্র সচিবের নতুন দিল্লী সফরে প্রদান করা বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন এবং বলেন যে বিভিন্ন দেশ এখন মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের সাথে জঙ্গিবাদের একটা যোগসূত্র দেখাতে চাচ্ছে। তার মতে এই জঙ্গিবাদের বিষয়টির প্রতি ভালোভাবে নজর দিতে হবে এবং এই ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। জঙ্গিবাদের সাথে যে এর কোন সম্পর্ক নেই সেটা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে এবং এই অবস্থানকে শক্তিশালী করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি আরো বলেন যে তিনি কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত পার্মানেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনাল (Permanent Peoples Tribunal) এর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং টানা চারদিন তিনি উখিয়াতে সেখানকার পরিস্থিতি দেখে এসেছেন। তার মতে প্রথমত, সমস্যাটাকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। পার্মামেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনাল এটাকে গণহত্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। গণহত্যা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই আছে এই বিষয়টিতে। ফরাসী রাষ্ট্রপতিও এটাকে গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, তার মতে বাংলাদেশ সরকারের রোহিঙ্গাদেরকে 'শরণার্থী' হিসেবে আখ্যায়িত করা উচিত। এর আগে বাংলাদেশ সরকার এদেরকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল এবং এখন তাদেরকে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক বলা হচ্ছে। তার মতে বাংলাদেশ সরকারের উচিত রোহিঙ্গাদেরকে 'শরণার্থী' হিসেবে আখ্যায়িত করা। যেহেতু তারা আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে, সেহেতু তাদেরকে 'শরণার্থী' বলা যেতে পারে। তারা মিয়ানমরের নাগরিক, কিন্তু মিয়ানমার সরকারের জাতিগত নিপীড়নের শিকার। জাতিগত নিপীড়নের কারণেই

তারা আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। তার মতে বাংলাদেশ সরকার যদি তাদের 'শরণার্থী' হিসেবে আখ্যায়িত করে তাহলে তাদের প্রত্যাবর্তনের যে অধিকার রয়েছে তা নিশ্চিত করা যাবে। তার মতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সময়ও তাদের 'শরণার্থী' বলা উচিত। তিনি বলেন যে ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে মিয়ানমার যে উত্তরপত্র দিয়েছে এবং ২৭ সেপ্টেম্বরে মিয়ানমার জাতিসংঘকে যেই তথ্য দিয়েছে তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, মিয়ানমার বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া মিয়ানমার 'শরণার্থীদের' দেশে ফিরিয়ে নিবে। এখন যদি বাংলাদেশ এদেরকে 'শরণার্থী' হিসেবে আখ্যায়িত না করে তাহলে মিয়ানমার হয়ত এই বিষয়টিকে একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

তার মতে, 'শরণার্থীদের' মধ্যে বিভাজন করার বিষয়টি অপ্রয়োজনীয়। যারা ক্যাম্পে থাকে তারা একধরনের আবার যারা ক্যাম্পের বাইরে থাকে তারা একধরনের, যারা আগে এসেছে, আবার যারা এখন আসছে-এই রকম বিভাজন করাটা তার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। তারমতে, সবাই একইরকম নিপীড়নের শিকার এবং এদের সবাইকে একইরকমভাবে দেখা উচিত। সর্বশেষে তিনি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক দায়ভার বহন ও বন্টন (international burden sharing) এর বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তার মতে এটা এখনো কাজ করছে কিন্তু এদের 'শরণার্থী' হিসেবে আখ্যায়িত করা না হলে বিষয়টি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে পারে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) সাব্বির আহমেদ, ওএসপি, এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি, প্রাক্তন চিফ অব জেনারেল স্টাফ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, জাতীয় পর্যায়ে রোহিঙ্গাদের উপস্থিতির কথা বলতে গিয়ে বলেন যে রোহিঙ্গারা এখন বাংলাদেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা এদেশের প্রায় সব জায়গায় বিশেষ করে চট্টগ্রামের

সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের এইসব কর্মকান্ডে পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তার মতে রোহিঙ্গাদের যে করেই হোক একটি নির্দিষ্ট জায়গাতে রাখতে হবে। তারা যদি সবাই দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। তাদের কারণে অর্থনৈতিকভাবেও বাংলাদেশ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা যেখানে যাচ্ছে সেখানেই কম টাকার বিনিময়ে কাজ নিচ্ছে। তার মতে একজন রোহিঙ্গাকে ১০০ টাকার বিনিময়ে যে কাজ করানো যাবে সেটা একজন বাংলাদেশিকে দিয়ে করাতে গেলে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ খরচ পড়বে। এছাড়াও তিনি বলেন যে উত্তর কোরিয়া এবং পাকিস্তানেরও মিয়ানমারের সাথে ভাল সম্পর্ক আছে। তাঁর মতে, এই দুই দেশের ব্যাপারেও বাংলাদেশের সরকারের ভাবা উচিত। তিনি আরো একটা বিষয় তুলে ধরেন, যেটা হচ্ছে মানবপাচারকারী চক্রের উৎপাত। তার মতে মানবপাচারকারী চক্র রোহিঙ্গাদের নিয়ে থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ায় পাচার করে দেয়।

মেজর জেনারেল (অবঃ) আমসাআ আমিন, এনডিসি, পিএসসি, চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর সিকিউরিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (CSDS), আলোচনার শুরুতে বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যাটাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে যাতে করে সমস্যাটাকে ভালোভাবে বোঝা যায়। বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমারের সম্পর্কটা কোন অবস্থায় আছে সেটাও বুঝতে হবে। এই সম্পর্কটার মধ্যে এখন বাংলাদেশের নীতি কি? যুদ্ধ কৌশলগত (tactical) হবে নাকি ফায়ার ব্রিগেড একশন (fire brigade action) হবে সেটা ঠিক করতে হবে। ভূ-অর্থনৈতিক (geo-economic) এবং ভূ-কৌশল (geo-strategic) দুটো বিষয় এক করে একটা গ্র্যান্ড কৌশলের (grand strategy) কথা ভাবতে হবে। এটার একটা সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। পরবর্তী ২০/৩০ বছর পর কি হবে সেটা ভাবতে হবে।

তার মতে এই সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশের এখনো কোন গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা হয়নি। বাংলাদেশ এখন একটা আদর্শবাদী অবস্থান (idealist position) নিয়ে চলছে। তার মতে, এখনকার বিশ্বে আদর্শবাদের কোন স্থান নেই। বাংলাদেশকে তাই একটা শক্ত বাস্তবভিত্তিক অবস্থান নিতে হবে। তিনি 'জাতীয় নিরাপত্তানীতি' নিয়মিতভাবে তৈরি করার ব্যাপারেও জোর দেন।

তিনি জাতীয় সংসদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেন। তার মতে নিয়মিতভাবে এই বিষয়টি সংসদে আলোচনার জন্য তুলতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামতও নিতে হবে। তিনি মনে করেন এখনো সমন্বয়ের অভাব আছে। এছাড়া বাংলাদেশের কোনো ফোকাল পয়েন্টও নেই যে বিষয়টি নিয়ে সবসময় কাজ করবে। তিনি আরো বলেন যে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল বলে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। বল্কানাইজেশনেরও প্রশ্ন আছে এখানে। সব দিক নজর রাখতে হবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য কি সেটাও বুঝতে হবে। মিয়ানমার বিশ্বকে অস্বীকার করে আসছে। তারা আমাদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়া পঞ্চম রাষ্ট্র ছিল। তার মতে মিয়ানমারকে বুঝাতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ মিয়ানমারের প্রতি উদাসীন এবং মিয়ানমারও বাংলাদশের প্রতি উদাসীন। তার মতে বাংলাদেশকে বাস্তববাদী পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) চৌধুরী খালেকুজ্জামান, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, মিয়ানমার সম্পর্কে তার কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, মিয়ানমারের সাথে কোন সমঝোতায় আসা কঠিন কারণ তারা কথা দিয়ে কথা রাখেনা। তিনি এখানে উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সম্পাদিত দুটি চুক্তির কথা বলেন। এর মধ্যে একটি চুক্তি ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে হয় তখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন তবারক হোসেন। এই চুক্তির বিষয় ছিল রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন। অন্য চুক্তিটি হয় ১৯৯৩ সালে। ঐ চুক্তি সম্পাদনের সময় তিনি মিয়ানমার যান ১৯৯৩ সালে এবং ফিরেন ১৯৯৭ সালের শেষার্ধে। উভয় চুক্তিতেই লেখা আছে বাংলাদেশে অবস্থানরত সব রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন করানো হবে। ১৯৯৭ সালে ২১ হাজার রোহিঙ্গা ছাড়া বাকি সবাইকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসিত করানো হয়। ১৯৭৮ সালের চুক্তির একটি অনুচ্ছেদে বলা হয় যে রোহিঙ্গাদের তারা মিয়ানমারের বৈধ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিবে। মিয়ানমারে সর্বমোট ১৩৫ জাতিগোষ্ঠী আছে কিন্তু হঠাৎ করেই রোহিঙ্গা ছাড়া অন্যসব জাতিকে ১৯৮২ সালে বৈধ নাগরিকত্ব দেয়া হয়। তিনি এখানে প্রশ্ন করেন ১৯৭৮ সাল থেকে দীর্ঘ সময় ধরে যদিও এই চুক্তি কার্যকর ছিল তাহলে কেন হঠাৎ করেই এই চুক্তি মিয়ানমার সরকার মেনে নেয়নি। তার মতে বাংলাদশে সরকারকে কূটনৈতিকভাবে এমন কিছু করতে হবে যেন মিয়ানমার সরকার আবার এই চুক্তিকে বৈধ হিসেবে মেনে নেয়।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) সাফায়াত আহমদ, এনডিসি, পিএসসি, কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। প্রথমত, ২০১০ সালে ইউএসডিপি (USDP) সরকার ৭ লাখ রোহিঙ্গাদের ভোট দানের অধিকার দেয়। অর্থাৎ মিয়ানমারের বৈধ নাগরিক হিসেবে রোহিঙ্গাদের মেনে নেওয়া হয়। তার মতে যারা মিয়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করবেন তাদের এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, তিনি মিয়ানমারে ভারতের কালাদান বহুমুখী প্রকল্প (Kaladan Multi Modal Project) এর কথা উল্লেখ করেন। তিনি এ বিষয়ে আরও বলেন যে কালাদান প্রকল্প যে অঞ্চলে বিস্তৃত রোহিঙ্গারা সেই সব এলাকা থেকে চলে এসেছে। তিনি প্রশ্ন করেন কালাদান প্রকল্পের কোন প্রভাব কী রোহিঙ্গা সঙ্কটের উপর আছে কিনা। তৃতীয়ত, এমন অনেক

রোহিঙ্গা সৌদি আরবে আছেন যাদের বাংলাদেশের পাসপোর্ট আছে। তার মতে এই সঙ্কটের দ্রুত সমাধান কঠিন। তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেন বিহারী গোষ্ঠী তৈরি হবার সম্ভাবনা হয়তো তৈরি হতে পারে তাই তিনি এই বিষয়ে সতর্ক থাকার বিষয়ে পরামর্শ দেন। চতুর্থত, তিনি বাংলাদেশ সরকারের রোহিঙ্গা নিবন্ধন করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠনকে অন্তর্ভূক্ত করার কথা বলেন যেন এই নিবন্ধনের গ্রহনযোগ্যতার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না থাকে। পঞ্চমত, মাদক একটি বড় সমস্যা। আর রোহিঙ্গারা যেখানে থাকে সেখানে মাদক ব্যবসার একটি মূল স্থাপিত হয়, তাই তিনি এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের কথা উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তার বক্তব্যের শুরুতে তার দুটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। প্রথমত, তিনি যখন ভিসা সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য একটি দূতাবাসে যান তখন দূতাবাসের First Officer তার কাছে রোহিঙ্গা বিষয়ে তার মতামত জানতে চান। উত্তরে তিনি বলেন বাংলাদেশ যেমন ঝড়, বন্যা, বৃষ্টি, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দ্বারা আক্রান্ত তেমনই বর্তমানে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার সব রাষ্ট্রই সন্ত্রাস দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্মুখীন এই রোহিঙ্গা সঙ্কটের জন্য।

দ্বিতীয়ত, তিনি যখন বিমসটেক (BIMSTEC)-এর এক সেমিনারে যান সেখানে মিয়ানমারের একজন নাগরিক পো-এর সাথে দেখা হয়। তিনি পো'র কাছে জানতে চান যে মিয়ানমারে কী হচ্ছে। উত্তরে সে বলে রোহিঙ্গারা লেখাপড়া জানেনা, এরা অনেক গরীব এবং এদের ৫/৬টি করে সন্তান জন্ম নেয়। তখন তিনি পো'র কাছে জানতে চান তার মা, বাবাদের এবং তার নিজের কয়জন ভাই-বোন আছে। উত্তরে পো বলে তার মায়েরা ৬ ভাই-বোন, বাবারা ৭ ভাই-বোন এবং পো-এর নিজের ৬ ভাই-বোন আছে। পো'র এই উত্তরে অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেন জানতে চান তাহলে কেন তাদেরও মেরে ফেলা হচ্ছেনা। কিন্তু পো কোন উত্তর দেয়নি। সেই একই সেমিনারে তার বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমার দূতাবাসের একজনের সাথেও কথা হয়, তার কাছে মিয়ানমারে কী হচ্ছে সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন আসলে সেখানে কী হচ্ছে তা তারা জানেন না। অধ্যাপক ড. শওকত আরা হোসেনের মতে মিয়ানমারে সরকারি কর্মকর্তাদের কিছুই জানানো হয়না। সেখানে সেনাবহিনী যা করেন বা বলেন সেটাই সরকারি কর্মকর্তারা করেন বা বলেন। তার বক্তব্যের শেষে তিনি টেলিভিশনের একটি প্রতিবেদনের উপর আলোকপাত করেন। সে প্রতিবেদনে দেখানো হয় যারা রোহিঙ্গাদের ত্রাণ দিচ্ছেন তাদের অনেকেই ত্রাণ হিসেবে কুরআন শরীফ, রেহেল এবং জায়নামাজ দিচ্ছেন। তার মতে এটি একটি ভয়ানক বার্তা বহন করছে তাই তিনি সবাইকে এই ব্যাপারে সাবধান হবার পরামর্শ দেন।

অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার, রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস্ রিসার্স ইউনিট (RMMRU)-এর মতে রোহিঙ্গা সমস্যাটির পাঁচটি দিক রয়েছে সেগুলো হলো কূটনৈতিক, মানবিক, নিরাপত্তা, ইতিহাস চর্চা ও আইনগত। এই পাঁচটি দিকের মধ্যে থেকে তিনি তিনটি দিকের উপর আলোকপাত করার জন্য কিছু বিষয় তুলে ধরেন। প্রথমত, তিনি সরকারের ত্রাণ ব্যবস্থাপনার কথা বলেন। পূর্বে ও বর্তমানে ত্রাণ ব্যবস্থাপনার যে সমস্যা দেখা গিয়েছে সেটা কিছু দিনের জন্য দূর হয়েছে। কারণ সেখানে এখন একটি সমন্বিত কাঠামো চলে এসেছে। তার মতে ত্রাণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় যুক্ত করা দরকার। এক্ষেত্রে তিনি রোহিঙ্গাদের নিবন্ধনের বিষয়টি নিয়ে আসেন। যেহেতু রোহিঙ্গারা নিবন্ধন করতে চাচ্ছেনা সেহেতু তাদের বোঝাতে হবে যে নিবন্ধনের মাধ্যমে তাদের যে রোহিঙ্গা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে

সেটা তাদের মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার জন্য না বরং তাদের ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত। ত্রাণ ব্যবস্থানায় তিনি এলাকাভিত্তিক এনজিওগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। তার মতে দাতাগোষ্ঠীর নজর থাকে বড় বড় এনজিওগুলোর উপর আর বড় বড় এনজিওগুলোর উদ্দেশ্য থাকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিজেদের প্রচারণা বাড়ানো। দেখা যায় শতকরা ২৫ ভাগ সাহায্য এইসব এনজিওগুলোর কাছে চলে যাচ্ছে। এজন্য এলাকাভিত্তিক এনজিও যারা রোহিঙ্গাদের দুঃখ, কষ্ট, ভাষা বোঝেন তাদের এই ত্রাণ কার্যক্রম এবং নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত করার অনুরোধ করেন।

দ্বিতীয়ত, মাঠপর্যায়ে যারা রোহিঙ্গা আশ্রয়স্থলে গেছেন তারা রোহিঙ্গা নারীদের মধ্যে সেনাবাহিনীর পোশাক তথা সেনাবহিনীকে ভয় পাবার বিষয়টি লক্ষ্য করেন। এক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ দেন যে, এদের বোঝাতে হবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মিয়ানমারের সেনাবহিনীর মতো না। তারা এখানে এসেছে রোহিঙ্গাদের সাহায্য করার জন্য ক্ষতি করার জন্য নয়। এছাড়াও নারীরা যেন পাচারচক্রের কবলে না পড়ে সেজন্য এখন থেকেই এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

তৃতীয়ত, রোহিঙ্গারা চায় তাদের এই রোহিঙ্গা পরিচয়টি বহাল থাকুক। কিন্তু তার মতে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য তাদের যে বার্মিজ পরিচয় (Burmese identity) দরকার সেটার সাথে তাদের পরিচিত করে তুলতে হবে। এখানে সমস্যা হচ্ছে রোহিঙ্গারা বার্মিজ (Burmese) ভাষায় কথা বলতে পারেনা। তাই রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিকভাবে খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা ছাড়াও ধীরে ধীরে আশ্রয়স্থলে যারা বার্মিজ ভাষায় কথা বলতে পারে তাদের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের বার্মিজ পরিচয়ের সাথে পরিচিত করানো যাতে দীর্ঘ ও মধ্যম মেয়াদে যখনই তারা মিয়ানমারে ফিরে যাবে তখন যেন তাদের সেখানে অন্তর্ভূক্ত হতে সমস্যা না হয়।

চতুর্থত, তার মতে রোহিঙ্গা সংকটকে গণহত্যা বলা উচিৎ। গণআদালতে এটাকে গণহত্যা বলে রায় দেয়া হয়েছে এবং এখন চাইলে এই রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়া যাবে। এই রায়টা প্রমাণ হিসেবে আদালতে দেখানো যাবে। তার মতে, এই সমস্যাটির আইনগত দিকটির উপরও কাজ করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে সরকার নয় বরং শিক্ষাবিদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষাবিদদের গণহত্যা, অপরাধতত্ত্ব ইত্যাদির উপর আইনগত সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করে সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করতে হবে প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করার জন্য। এতে অনেক ভুলবোঝাবুঝির অবসান হবে বলে তিনি মনে করেন।

জনাব মোঃ হাবিবুল কবির চৌধুরী, যুগ্ম সচিব, শরনার্থী সেলের প্রধান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকীর আলোচনার প্রেক্ষিতে বলেন, এলাকা ভিত্তিক এনজিওগুলোও রোহিঙ্গাদের ত্রাণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট আছে। তিনি বলেন রোহিঙ্গাদের একটি 'বার্মিজ পরিচিতি' তৈরি করার ব্যাপারটি সরকার চিন্তাভাবনা করছে। সরকার খাদ্য, পানি ব্যবস্থাপনা ছাড়াও রোহিঙ্গা শিশুদের বার্মিজ ভাষায় শিক্ষিত করার কথা চিন্তা করছে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সরকারও রোহিঙ্গা নিবন্ধন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করার কথা ভাবছে যেন নিবন্ধনটি মিয়ানমার সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহনযোগ্যতা পায়।

জনাব মোঃ শহীদুল হক, পররাষ্ট্র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রোহিঙ্গাদের নিবন্ধনে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্টতার প্রশ্নে বলেন, যদিও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিন্তু ইউএনএইচসিআর, ইউনিসেফ, ডব্লিউএফপি, আইওএম এই কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। এমনকি খাদ্য বিতরণের জন্য ডব্লিউএফপি যে ইউনিট পদ্ধতি ব্যবহার করে সেটাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অনুসরণ করছে তাই এই বিষয়ে উদ্বেগের কোনো অবকাশ নেই।

রোহিঙ্গা সঙ্কটকে গণহত্যা হিসেবে অবহিত করার ব্যাপারে তিনি বলেন, অনেক কার্যক্রমই পরিচালিত হচ্ছে এই বিষয়ে যার সব কিছু জনসম্মুখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি শুধু অবহিত করেন যে দুটো পদ্ধতির কথা অধ্যাপক আবরার ও অধ্যাপক তাসনিম সিদ্দিকী তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করার বিষয়ে, সেগুলোই অনুসরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রমাণপত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা চলছে এই বিষয়ে।

তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেনের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, শুধু পাঁচটি দেশ নয়, পঁচিশটি দেশকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে। তিনি আরও অবহিত করেন যে, সৌদি আরবে আশি হাজার রোহিঙ্গা আছে এবং এদের বেশিরভাগ ১৯৫০, ১৯৬০ ও ১৯৭০ শতকের দিকে পাকিস্তানি পাসপোর্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গেছেন। তবে পরবর্তীতে কিছু বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহারের মাধ্যমেও গেছেন। তিনি ওআইসির সম্পৃক্ততার ব্যাপারে বলেন, ওআইসি বাংলাদেশের সাথে আছে কিন্তু যত ঘনিষ্ঠভাবে থাকার কথা সেভাবে নেই, যেহেতু তাদের চারপাশেই অনেক সমস্যা বিদ্যমান। তিনি অধ্যাপক আবরারকে ধন্যবাদ জানান, রোহিঙ্গা সঙ্কটকে মানবিকতা রক্ষার বিষয় হিসেবে অবহিত করার জন্য। মূলত এই সঙ্কটের কথা তুলে এনে তিনি বলেন, এই ধরনের সঙ্কটের সময় পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরি তাদের সীমান্তে সেনাবাহিনী নিযুক্ত করেছিলো যেন মানুষ তাদের দেশে ঢুকতে না পারে। এই দেশগুলোর সাথে তিনি বাংলাদেশের তুলনা করে বলেন, এত সংখ্যক রোহিঙ্গাকে ঢুকতে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সত্যিই সাহসিকতা ও মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন যেটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে।

তার মতে, রোহিঙ্গা সমস্যার বিষয়ে সুশীল সমাজের তৎপরতায় ঘাটতি রয়েছে। সুশীল সমাজকে এই সঙ্কটের বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সাথে সমানভাবে অংশগ্রহন করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এই ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের যদি কোন সহায়তা দরকার হয় সেটা সরকার দিবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। অধ্যাপক আবরার উত্থাপিত 'শরণার্থী' বনাম 'বাস্তুচ্যুত' বিষয়ক বিতর্কের ব্যাপারে বলেন রোহিঙ্গাদের তৃতীয় কোন দেশে পুনর্বাসন সম্ভব নয়। তিনি এখানে অতীতে নেপালে যাওয়া ভূটানীয় শরণার্থীদের কথা উল্লেখ করেন যাদের সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। এদেরকে তৃতীয় দেশ, যেমন ইউরোপে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। কিন্তু এটা বর্তমান রোহিঙ্গা সংকটের ক্ষেত্রে সম্ভব হবেনা কারণ, ভূটানীয় শরণার্থী সংকটে তৃতীয় দেশের যে প্রাধান্যগুলো (Priorities) ছিল সেগুলো রোহিঙ্গা সংকটে নেই। তাই তাদের মিয়ানমার প্রেরনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া শরনার্থী শব্দটি খুব দ্রুত রূপান্তর হয়েছে এবং ১৯৫১ সালের শরনার্থী সম্মেলনের ব্যাপরে ব্যাপক মতবিরোধ আছে। এমনকি অনেক দেশ এই সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসতে চেয়েছে। কেন মিয়ানমার সরকার এদের হঠাৎ করেই শরণার্থী বলে অবহিত করছে সেই বিষয়ে সবাইকে চিন্তা করার

কথা বলেন তিনি। তার মতে এটার মাধ্যমে মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশকে একটি ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। যাতে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফিরতে না পারে। তিনি সকলকে অবহিত করেন যে ইউএনএইচসিআর শুধু শরণার্থী নয়, সাথে People of Concerned নিয়েও কাজ করে এবং রোহিঙ্গারাও People of Concerned এর মধ্যে পড়ে, সেই কারণে এদের শরণার্থী না বললেও ইউএনএইচসিআরের কার্যক্রমের মধ্যে কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যেই গন্ডগোল আছে। তিনি সব সময়ই এইসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানবিকতার বিষয়টাকে বড় করে দেখার অনুরোধ করে যাচ্ছেন। ভারতের সহযোগিতার প্রশ্নে তিনি বলেন, ভারত সবসময়ই বাংলাদেশের সংকটময় মুহূর্তে পাশে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। রোহিঙ্গা সংকটেও ভারত বাংলাদেশের সাথে আছে। তার মতে ২৯ সেপ্টেম্বর মানবিক অধিকার কমিশনে ভারত রোহিঙ্গা সংকটের ওপর দুই পৃষ্ঠার যে বিবৃতি দিয়েছে সেটা বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সহমর্মিতার বহি:প্রকাশ।

সমাপনী বক্তব্য

জনাব মো: শাহরিয়ার আলম,এমপি
মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব মো: শাহরিয়ার আলম, এমপি, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তার সমাপনী বক্তব্যে মূলত উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উপর আলোকপাত করেন। মিয়ানমার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে আসা মানুষগুলোর ক্ষেত্রে ইংরেজি "রিফিউজি" এবং বাংলায় 'শরণার্থী' শব্দ দুটি ব্যবহারের প্রশ্নে তিনি বলেন যদিও এ দুটি শব্দ একই অর্থ বহন করে কিন্তু তার মতে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে শরণার্থী শব্দটি ব্যবহার করলে বাংলাদেশের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হবে কারণ, মিয়ানমার বাংলাদেশকে ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছে রোহিঙ্গাদের 'শরণার্থী' হিসেবে অবহিত করার মাধ্যমে, যাতে বাংলাদেশ তাদের ফেরত পাঠাতে না পারে। এ ক্ষেত্রে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী দুটি বিষয় উল্লেখ করেন।

প্রথমত, ১৯৫৪ সালে রিফিউজি কনভেনশন যখন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করা হয় তখন এর মূল নীতি ছিল "নন রিফাউলমেন্ট" (non-refoulement) যার অর্থ 'শরণার্থীদের' জোর করে ফেরত পাঠানো যাবেনা"। তিনি বলেন বাংলাদেশ সরকার জোর করে কাউকে ফেরত পাঠাতেও চায় না অর্থাৎ বাংলাদেশে সরকার রিফিউজি কনভেনশনের মূলনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, 'শরণার্থী' সংজ্ঞার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে। একটি হচ্ছে রাষ্ট্রহীনতা এবং অন্যটি হচ্ছে নিপীড়ন। যদি এই মানুষগুলোর মধ্যে এই দুটি বিষয় থাকে তাহলে রোহিঙ্গাদেরকে 'শরণার্থী' বললে তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মিয়ানমারের ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা না হয় অথবা রোহিঙ্গা নিধন সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ না হয়।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত সম্মানিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেন, গোলটেবিল আলোচনায় স্বল্প সময়ের মধ্যে হয়তো অনেকেই তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারেননি। তাই কেউ যদি পরবর্তীতে তাদের মতামত জানাতে চান, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাদেরকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত বিআইআইএসএস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার অনুরোধ জানান। তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক উপস্থাপিত দৈনিক প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে দু:খ প্রকাশ করেন। ওআইসি বিষয়ে তিনি বলেন যদিও বর্তমানে নেতৃত্বের জায়গা থেকে ওআইসি-এর ভূমিকা কমে এসেছে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য, তবুও ওআইসি ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে মালয়েশিয়াতে একটি পার্লামেন্টারিয়ান সভায় রোহিঙ্গা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা

করেছে। সেখান থেকে রেজুলেশন এবং বিবৃতিও দেয়া হয়েছে বলে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন। কিন্তু ওআইসি বলার পরেই যে মিয়ানমার সাথে সাথে এ বিষয়ে কাজ করবে তা ঠিক নয়। বরং ওআইসিভুক্ত সেই দেশগুলো ভূমিকা রাখতে পারে যাদের সাথে মিয়ানমারের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে এবং যেসব দেশ মিয়ানমারের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আশ্বস্ত করেন, সরকার সেই দেশগুলোর সাথেই কাজ করছে। আর ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে তিনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান এবং সৌদি আরবের এই বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পশ্চিমা বিশ্বের মতো তৃতীয় বিশ্বে কিছু ঘটলেই সেই বিষয়ে বিবৃতি অথবা ডিপ্লোম্যাটিক ব্রিফিং-এর মাধ্যমে উদ্বেগ প্রকাশ করার সংস্কৃতি নেই। তিনি উল্লেখ করেন, এ সকল কারণে সাধারণ নাগরিকদের চোখে ওআইসিভুক্ত দেশগুলির সম্পৃক্ততা দৃশ্যমান হয়না; কিন্তু তিনি জানান আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান না হলেও রোহিঙ্গা সংকটের সাথে এদেশগুলির সম্পৃক্তা নেই মনে করার কোন সুযোগ নেই। তিনি উল্লেখ করেন যে এ পর্যন্ত ১৩টি দেশ থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, সরকার রামু ঘটনার পরে খুব সতর্কতার সাথে এনজিও, আইএনজিও এবং স্থানীয় এনজিও সমূহের কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করছে। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন এসব সংস্থাকে ব্যবহার করে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চক্রান্ত হতে পারে। তারপরেও অতি সম্প্রতি প্রায় ২৫টি সংস্থাকে রোহিঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় কাজ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

১৯ দিনে ৪ লাখ মানুষের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে যাওয়ার ঘটনাকে বিশ্বের ইতিহাসে বিরল হিসেবে উল্লেখ করে মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন যে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদিনই বাড়ছে। তার মতে হঠাৎ এমন পরিস্থিতিতে যতই প্রস্তুতি থাকুক না কেন যে কোনও দেশই সমস্যায় পড়তে পারে। কারণ এমন ঘটনার (৫ লাখ মানুষের অন্ন-বস্ত্রের দায়িত্ব) জন্য সর্বদা কেউই প্রস্তুত থাকেনা বা অপেক্ষা করেনা। সেরকম কোন প্রস্তুতি না থাকার পরেও গত দুই সপ্তাহে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেবা ও পানি পাচ্ছে কিন্তু আবাসন সমস্যা এখনও সমাধান করা সম্ভব হয়নি। যা ন্যূনতম পর্যায়ে সম্পন্ন করতে হয়ত আরও ২/৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগবে। এ অবস্থায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলেন, সেখানেও বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এর আগে নিরাপত্তা পরিষদের কিছু রাষ্ট্র রোহিঙ্গা বিষয়ক প্রস্তাবনার উপর ভেটো প্রদান করেছে, তাই বাংলাদেশ এবার staggered approach গ্রহণ করেছে। যদিও বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য না, এমন কী অস্থায়ী সদস্যও না কিন্তু তারপরও নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের নিয়ে রুদ্ধ দ্বার বৈঠক আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে এবং সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। এর পরে উন্মুক্ত আলোচনাও হয়েছে যেটি প্রকাশ্যে সম্প্রচারও করা হয়েছে। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মতে এসব কিছুই ধাপে ধাপে একটা উন্নতির লক্ষণ।

রোহিঙ্গা ইস্যুর প্রভাব যে বিশ্বব্যাপী পড়ছে সেটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহের কথা উল্লেখ করেন। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে ২০১৪ সালে আসিয়ানভুক্ত একটি রাষ্ট্র, কম্বোডিয়ার স্বরাষ্ট্র সচিব বাংলাদেশে সফর করেন এবং তখন তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়েই আলোচনা করেন। তিনি আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, তারা জোটভুক্ত অন্য কোন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে কখনও সম্পৃক্ত হয়না। আসিয়ান অনেকটা অর্থনৈতিক জোটের মতো। কিন্তু বর্তমানে আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহের মধ্যেও একটি শক্ত প্রতিবাদের উদ্ভব হয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে এবং এ কারণে আসিয়ানে একটি পরিবর্তন এসেছে। অর্থাৎ কিছু রাষ্ট্র এক পক্ষে এবং কিছু রাষ্ট্র অপর পক্ষে, এরকম একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে। সংসদের প্রসঙ্গে তিনি জাতীয়তবাদী দলের সরকারি দলের নিন্দা না জানানোর অভিযোগ অস্বীকার করে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. দীপুমনির resolution table, প্রধানমন্ত্রীর নোট ও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উদ্বোধনী বক্তব্য-এর কথা উল্লেখ করেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এর দিকে পার্লামেন্টের কিছু কার্যক্রমের নথি পার্লামেন্ট গ্রন্থাগার থেকে নিয়ে আসেন বলে জানান এবং উপস্থিত উৎসুকদের তা মেইল এবং ডাকযোগে পাঠানোর অঙ্গিকারও করেন। তিনি নথির

উল্লেখ করে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী দল কর্তৃক আওয়ামী-লীগকে আলোচনা বা প্রস্তাবনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার প্রসঙ্গে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের একটি কথার উদ্বৃতি দেন যেখানে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন "এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়, এটা সবাই শুনলে, দেখলে সরকার অনেক সমস্যায় পড়ে যেতে পারে তাই আপনারা একটু বুঝে শুনে বক্তব্য দিবেন" । তার মতে সেই দলই যখন আবার বর্তমান সরকারের কার্যক্রম নিয়ে অভিযোগ করে তখন তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় । তিনি সকলকে অবহিত করেন যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কী করনীয়, সরকারের কী করণীয় সেই ব্যাপারে একটি রেজুলেশন সংসদে পেশ করা হয়েছে । মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, মিয়ানমারের বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের সাথে যোগাযোগ করা বেশ কষ্টসাধ্য একটি ব্যাপার । তিনি এ ব্যাপারে তার দুটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন । প্রথমে তিনি ২০১৪-১৫ সালের দিকের ঘটনার উল্লেখ করেন যখন অং সান সুচির সরকার ক্ষমতায় আসেনি তখন মিয়ানমারের ব্যাপারে বাংলাদেশের একটি পত্রিকায় কলামে একজন নিজের মতো করে লিখেছিলেন সেখানকার বেশ কিছু অংশ মিয়ানমার সরকার পছন্দ করেনি । এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে বাংলাদেশের পত্রিকায় এমন লেখার কারণ জানতে চাওয়া হয় । বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বিষয়টি ব্যক্তিগত বাক স্বাধীনতার বহি:প্রকাশ হিসেবে উল্লেখ করলে মিয়ানমার সরকার তা মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং ঘটনার পিছনে বাংলাদেশ সরকারের ইন্ধন আছে বলে দাবি করে । মিয়ানমার কতটা বিচ্ছিন্ন এবং ভিন্ন চিন্তাধারার তার উদাহরণস্বরূপ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তার আরো একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন । যেখানে তিনি মিয়ানমারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সামাজিক কথপোকথন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনীহার প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোকপাত করেন । মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আরেকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন আর তা হলো গণতন্ত্র । তিনি মনে করেন গণতান্ত্রিকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গণতন্ত্র যেমন সক্রিয় ছিল মিয়ানমারের ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য নয় । কারণ মিয়ানমারে যারা সামরিক শাসন চান তারা গণতন্ত্র একদমই পছন্দ করে না । এমনকি মিয়ানমারের অনেকেই মনে করেন গণতন্ত্র মানেই সমস্যা ।

মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে আবারও নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপারে বলেন যে, যদিও পরিষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথাপি তা একমাত্র সমাধানের পথ নয় । তিনি মিয়ানমারের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মত ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউরোপীয় কাউন্সিল রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সময় মিয়ানমারকে তখন পরিচালনা করেছিল কিন্তু জাতিসংঘ শুধু সমর্থন করেছে । রোহিঙ্গা ইস্যুতে এই তিনটি পক্ষের অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা এই বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে সম্মত আছে । তার মতে এই তিনটি পক্ষ যেহেতু বাংলাদেশের পক্ষে আছে তাই নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন আসতে দেরি হলেও এই তিন পক্ষের সহায়তায় এই সঙ্কটের দ্রুত সমাধান সম্ভব বলেই তিনি মনে করেন ।

সুপারিশমালা

গোলটেবিল আলোচনায় রোহিঙ্গা সংকট সংক্রান্ত উপস্থাপনা, উন্মুক্ত আলোচনা এবং বিভিন্ন বক্তব্যে এ সংকটের ফলে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের ব্যবস্থাপনা, অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন তথাপি এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য করণীয় অসংখ্য প্রস্তাবনা ও সুপারিশ উত্থাপন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবনা ও সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক

- রোহিঙ্গা সমস্যাটিকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।
- রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকারের একটি সমন্বিত যোগাযোগ নীতি থাকতে হবে।
- শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক নয় বরং বহুপাক্ষিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
- ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
- বর্তমান রোহিঙ্গা সংকটকে একটি রাজনৈতিক সংকট হিসেবে বিবেচনা করে এর রাজনৈতিক সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- যেহেতু মিয়ানমার বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিবেশী সেহেতু তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি অনুসরণ করতে হবে।
- "গণহত্যা" শব্দটি আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর গুরুত্ব বহন করে। আর মিয়ানমারে সংগঠিত সংঘাতকে "গণহত্যা" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সেখানে পরিচালিত সকল নারকীয় হত্যাকান্ড, খুন, ধর্ষণ, বর্বরতা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাসমূহকে যথাযথভাবে নথিভূক্ত করতে হবে। যথাযথ প্রমান ব্যতীত এই সহিংসতাকে "গণহত্যা" হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপন করা যাবে না। এছাড়া, অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গাদের যে নথিভূক্তকরণ এবং নিবন্ধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে, তাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সংগঠনসমূহ, যেমন: জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।
- নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় এটি বাংলাদেশের জন্য প্রমাণ করা দুরূহ হবে যে অনুপ্রবেশকৃত রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক।
- বাংলাদেশের যে স্ট্র্যাটেজি পেপার আছে সেটিকে আরো পরিমার্জিত করতে হবে।
- রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে তৈরী সংকটে চীন, ভারত ও রাশিয়ার মত প্রভাবশালী রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন আদায়ের উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- কোন অবস্থাতেই মিয়ানমার সরকারের 'প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার' ফাঁদে পা দেয়া যাবেনা।
- অনতিবিলম্বে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ চার্টারের ৭ নং অধ্যায়ের অধীনে রেজুলেশন পাশ করতে হবে।
- বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যকার যেকোনো চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে জাতিসংঘের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, যেসব রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে মিয়ানমারে প্রত্যাবসান করানো সম্ভব হবে, তাদের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- বর্তমান প্রেক্ষাপটে মিয়ানমার সরকারকে প্রকাশ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য সমালোচনা করতে হবে।

- অতীত অভিজ্ঞাতার প্রেক্ষিতে খেয়াল রাখতে হবে যে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মিয়ানমার যেন তাদের উপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রশমন করার সুযোগ না পায়।
- রোহিঙ্গারা শুধু বাংলাদেশে নয়, তারা আরও পাঁচটি দেশে আছে এবং সেসব দেশেও রোহিঙ্গারা একটি সমস্যা। ঐ রাষ্ট্রগুলোকে সাথে নিয়ে মিয়ানমারের উপরে আরো বেশি চাপ প্রয়োগ করতে হবে।
- সরকারের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করতে হবে। যেটির ইংরেজি নাম হতে পারে 'Task Force' যার বাংলা অর্থ হচ্ছে 'কর্ম সম্পাদন কমিটি'। বিভাগীয় একটি কমিটি হতে পারে এবং বিশেষ পর্যায়ে একটি কমিটি হতে পারে যেখানে সুশীল সমাজের সদস্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদস্য, সেনাবাহিনীর সদস্য থাকতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে এই বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিবেন।
- বাংলাদেশ সরকারিভাবে ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে তিনটি দেশে (ভারত, চীন ও রাশিয়া) এবং যে সমস্ত দেশে রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করেছে, সেই সমস্ত দেশে পাঠাতে পারে। যারা রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টি এইসব দেশগুলোকে বোঝাবেন এবং কিভাবে এ সংকট সমাধান করা যায় এ ব্যাপারে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করবেন।
- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে মিয়ানমার সরকার উপর চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় জড়িত ব্যক্তিবর্গকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারের মুখোমুখি করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করা যেতে পারে যারা বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গণমাধ্যম থেকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করবে, যা পরবর্তীতে এ অপরাধের বিচার নিশ্চিত করতে ভূমিকা পালন করবে।
- কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারত, মিয়ানমার, চীন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াসহ আঞ্চলিক দেশসমূহকে অনুধাবন করাতে হবে যে দীর্ঘমেয়াদী রোহিঙ্গা সমস্যা এই অঞ্চলে মেরুকরণসহ সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের উত্থানে সহায়তা করবে।
- রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটু সু-সমন্বিত কৌশলগত পরিকল্পনা (ংঃৎধঃবমরপ ঢ়ষধহ) প্রণয়ন করতে হবে।
- রোহিঙ্গা সংকটের কারণে যেন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- তথ্য ও প্রচারমাধ্যমসমূহকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে নিয়মিতভাবে অবগত রাখতে হবে।

নিরাপত্তা সংক্রান্ত

- মিয়ানমার সরকার নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন, সীমান্তে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ও ট্যাংক মোতায়েনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে রোহিঙ্গা সংকটের সাথে সামরিকভাবে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন এবং সংযম প্রদর্শন করতে হবে।
- নৃশংসতা, গণহত্যা, জাতিগত নিধন যেসব অঞ্চলে চলে, সেই অঞ্চলগুলো মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদে জড়ানোর জন্য উর্বর হয়ে যায়। সন্ত্রাসবাদের এই সম্ভাব্য উত্থান মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের জন্যই বিপদজনক। এই ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।
- রোহিঙ্গাদের ভিতরে যে এতিম শিশুরা আছে তাদের ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। এদেরকে সঠিকভাবে যত্ন না নিলে, ভবিষ্যতে তারা বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাড়াবে।
- দীর্ঘমেয়াদে কক্সবাজারের মত পর্যটন স্থানে রোহিঙ্গাদের পূর্ণবাসন করা যাবে না। কারণ এতে কক্সবাজরের সৌন্দর্যহানি ঘটবে, স্থানীয় বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে এবং উক্ত এলাকা পর্যটক শূণ্য হয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরী হবে।
- রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মানবিক ও ত্রান সহায়তা

- রোহিঙ্গাদের যে করেই হোক একটি নির্দিষ্ট জায়গাতে রাখতে হবে।
- দীর্ঘমেয়াদে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অবস্থান করলে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর পরিমানে ত্রান সামগ্রীর জন্য বন্ধপ্রতীম দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে জোরালো প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক এনজিও, যারা রোহিঙ্গাদের দু:খ, কষ্ট, ভাষা বোঝেন তাদের ত্রাণ কার্যক্রম এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সাথে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিকভাবে খাদ্য, পানি ব্যবস্থা ছাড়াও ধীরে ধীরে আশ্রয়স্থলে যারা বার্মিজ ভাষায় কথা বলতে পারে তাদের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের বার্মিজ পরিচয়ের সাথে পরিচিত করাতে হবে যাতে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে যখনই তারা মিয়ানমারে ফিরে যাবে তখন যেন তাদের সেখানে অন্তর্ভূক্ত হতে সমস্যা না হয়।
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং এনজিওসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সু-সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সম্পাদনায়

এম আশিক রহমান, গবেষণা ফেলো
এ এস এম তারেক হাসান শিমুল, গবেষণা কর্মকর্তা
সাজিদ করিম, গবেষণা কর্মকর্তা
সানজিদা সাহাব উদ্দিন, গবেষণা কর্মকর্তা
সৈয়দা তানজিয়া সুলতানা, ইন্টার্ণ

তারিখঃ জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি
মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আয়োজনেঃ
অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস), ঢাকা
তারিখঃ ১০ অক্টোবর ২০১৭

The Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) is a statutory institution established in 1978 under the administrative control of the Ministry of Foreign Affairs, Government of Bangladesh, for undertaking and promoting research and deliberation on international affairs, security and developmental issues.

The priority areas of the Institute's research activities are: foreign policy, security and strategic issues with specific relevance for Bangladesh; regional, inter-regional and international cooperation, sustainable development with focus on resource management and environmental issues; conflict studies, peace keeping, disarmament, non-proliferation and area studies.

Contemporary issues of South Asian politics, security and development are the focus of research activities of the Institute. Ethno-religious issues, regional and sub-regional cooperation, globalisation and environmental issues are of special research interests. Problems of institutionalisation of democracy, economic liberalisation, trade and investment links, challenges of governance and strengthening the civil society receive significant scholarly attention.

The general guidance and superintendence of the Institute's affairs are vested upon the Board of Governors, headed by a Chairman and consisting of representatives of ministries, armed forces, academics and professionals. The Director General is the Member-Secretary of the Board and Chief Executive of the Institute. The main activities of the Institute are carried out by the Research Faculty consisting of a team of full-time researchers with varied social sciences background.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)
1/46, Old Elephant Road (West of Ramna Police Station), Dhaka-1000, Bangladesh
Fax: 88-02-48312625, E-mail: info@biiss.org, Website: www.biiss.org